কারবালার কথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র চৌধুরী

—সাহিত্য-সঙ্ঘ—
ঘোষ বাগান, কলিকাতা।

প্রকাশক :
শান্তিলতা চৌধুরী
৩নং ঘোষ বাগান লেন,
কলিকাতা—২

এই গ্রন্থের রচনা স্থান ও কাল কলিকাতা ভাদ্র, ১[illegible]

প্রিন্টার :
শ্রীনলিনীরঞ্জন দাশ
সবিতা প্রেস,
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

ঈশ্বর বিশ্বাসী জনগণের হাতে—

—গ্রন্থকার

ভাদ্র—১৩৫৯

কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন—

মহরম পর্ব্বের ঘটনা বহুল অংশের এই অংশ অপরদিকের আখ্যানভাগকে পরিষ্কার করে চোখের উপর তুলে ধ'রেছে।

এই ধর্ম্ম প্রেরণামূলক আখ্যান নিয়েই এই গ্রন্থ এগিয়ে চলে সমাপ্ত হ'য়েছে। পাঠক প'ড়ে তৃপ্তি পেলে খুসী থাকব।

কারবালার কথা

ষড়যন্ত্র—

মদিনার অধিপতি এমাম হাসান ও ছোট ভাই এমাম হোসেন দুই আদর্শ ভ্রাতা ছিলেন। সর্ব বিষয়ে দু'ভাইয়ের এমন মিল ছিল যা জগতে আর দেখা যায় না।

মদিনা নগর চিরকালের পবিত্র স্থান। প্রভু হজরৎ মহম্মদ এই মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। এইখানেই তাঁর দেহকৃত্য সমাধা হয়।

হজরৎ মহম্মদের দৌহিত্র প্রভুকন্যার হাসান হোসেন দুই পুত্র মহম্মদের বড় প্রিয় ছিলেন।

তাই পবিত্র বংশের সমস্ত কিছু ধারাই এদের শরীর বর্ত্তমান ছিল।

মদিনার উপর হজরতের আমোল থেকেই বিধর্মীর বড় উৎপাত। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের বিষয়ে অনেকে এই সময় বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই প্রায়ই মদিনার অধিবাসদের সবিশেষ ব্যস্ত থাকতে হত।

এই সময়ে দামেস্কর রাজা মাবিয়ার পুত্র এজিদ এই হাসান হোসেনের উপর অযথা উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেন।

এই সময় আবদুল জব্বার বলে একটি মূর্খের স্ত্রী জয়নাবকে নিয়ে এজিদ ও হাসানের ভিতর ভয়ানক অপ্রীতির সৃষ্টি হয়।

জয়নাবকে এজিদ বিয়ে করবে বলে এক পত্র দিয়ে কাসেদ পাঠান।

পথে এমাম হোসেনের সঙ্গে কাসেদ মোসলেমের সাক্ষাৎ হয়।

কথায় কথায় হাসান মোসলেমকে বল্লেন—বন্ধু মোসলেম তুমি কোথায় চল্লে এত ব্যস্তভাবে ?

—যাচ্ছি এক বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে জয়নাবের কাছে। এজিদ জয়নাবকে বিবাহ প্রস্তাব করে এক পত্র দিয়ে পাঠিয়েছে।

—আচ্ছা মোসলেম তুমি যখন যাচ্ছই তখন ভাই এজিদের কথা হলে পরে একবার আমার কথাটাও ব'লো আমিও তার একজন প্রার্থী।

—আচ্ছা ভাল কথা এমাম সাহেব। আপনি আমার বাল্যবন্ধু হোলেও পূজনীয় এমাম সাহেব সুতরাং নিশ্চয়ই আপনার কথা একবার বলব।

—বলো কিন্তু জয়নাবকে এজিদের রাজ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে আমাকে পছন্দ করবে! তা যদিও সম্ভব নয়। তবুও প্রস্তাবে আর কি দোষ আছে। অনেক স্ত্রীলোক আবার অর্থের চাইতে ধর্ম্মেরই আদর বেশী করে থাকেন।

—হ্যাঁ এমাম সাহেব তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আচ্ছা ফেরবার পথে আপনাকে খবর দিয়ে যাব।

মোসলেম ফেরবার পথে খবর দিয়ে। ফেরবার পথে সে খবর দিয়ে এলো জয়নাব এমাম হাসানের প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছে। এজিদ কে সে চায় না।

এইদিন থেকেই এজিদের শত্রুতা আরম্ভ হ'ল। এজিদের প্রিয় অন্তরের নিধিকে এমাম হাসান ভিক্ষেরি হ'য়েও ছো দিয়ে নিয়ে গেল।

এজিদ মহারাগে গর গর করতে লাগলো। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। হাসান বংশ ধ্বংশ না করে আমার স্বস্তি নেই। আর জয়নাবের এ দিন চিরস্থায়ি হবে না।

দেখে নিব জয়নাব এমাম হাসানকে কেমন করে রক্ষা করে তাই দেখে নেব আমি।

এজিদ সেইদিন থেকে যুদ্ধ করে ষড়যন্ত্র করে মারোয়ানকে সেনাপতি ক'রে পাঠালো এবং শেষটায় বিবি জাএদাকে দিয়ে এমাম হাসানকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হ'ল।

তারপর এলো অনুজ হোসেনের প্রাণবধ পালা। এমাম হাসানের মৃত্যুতে পুরী অবসাদে ঘুমিয়ে র'য়েছে। এজিদ রাজদরবারে ষড়যন্ত্র করে হাসানের হত্যাকারী জাএদা ও মায়মুনাকে এনে হত্যা করলেন।

তারপর সেনাপতি মারোয়ানকে চার সহস্র সৈন্য দিয়ে পুনরায় মদিনা আক্রমণ করতে যাত্রা করে দিলেন। মারোয়ান সৈন্যসহ মদিনায় এসে উপস্থিত হ'লেন। হাসানের মৃত্যুর পর হোসেন অহোরাত্রি রওজা শরীফে বাস করছেন।

এ কথা শুনে মারোয়ান খুবই চিন্তিত হ'য়ে পরলেন। পবিত্র রওজায় যুদ্ধ করা ঘোর পাপীর পক্ষেও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ করতে মোটেই তার সাহস হচ্ছিল না।

যুদ্ধ আহ্বান করলেও হোসেন কখনই তার মাতামহের সমাধি স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধে এগিয়ে আসবে না।

মারোয়ান মনে মনে এ বিষয় নিয়ে ভাবনা করতে করতে অস্থির হ'য়ে উঠল। কি করা যায় তার কোন সমাধান সে করে উঠতে পাচ্ছিল না। অথচ মহারাজ এজিদের হুকুম, আক্রমণ সুরু না কল্লে হয়ত মারোয়ানেরও গর্দ্দান যেতে পারে অনেক ভেবে শেষটায় সে অলীদকে বল্ল--

—ভাই অলীদ এখন উপায় কি? আমার প্রথম কাজ হোসেনের মুণ্ড নেয়া এবং দ্বিতীয় কাজ তার পরিবারের লোক-গুলিকে বন্দী করে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া।

—কি করে করি তাই ভেবেই ত' অস্থির হয়ে উঠেছি।

—এতে ভাবনার আর কি আছে। সোজা আক্রমণ করুন এত ভাবছেন কেন?

—ভাবছি হোসেন রওজা শরিফে আছে। এ অবস্থায় কি করে আক্রমণ করা যায়?

—রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করতে হ'লে আপনাকে এরই ভেতরই আক্রমণ করতে হবে।

—আচ্ছা এক কাজ করলে হয়না?

—কি কাজ বলুন।

—কথা হ'ল আগে গোপন বেশে গিয়ে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে এদের অবস্থা কিরূপ একবার দেখে আসা যাক।

—হ্যাঁ। তাহ'লে আমাদের আক্রমণের সুবিধা হবে।

—তবে তাই করুন।

—আচ্ছা আজ আমি নিজে ছদ্মবেশে পুরিতে প্রবেশ করব। তারপর কাল প্রথম আক্রমণ সুরু হ'বে।

কথাবর্ত্তা ঠিক হ'য়ে রইল।

সন্ধ্যা ঘোর ঘোর। নগরের বুকে গভীর তমসা নেমে আসছে।

মারোয়ান ওতবে অলীদের সঙ্গে ছদ্মবেশে রওনা হ'লেন।

ধীর পাদক্ষেপে তাঁরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন। ক্রমেই রওজার সম্মুখে এসে তাঁরা হাজির হ'য়ে গেলেন।

হোসেন ঈশ্বরের উপাসনায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেছেন। কোন দিকে কোন লক্ষ্য নাই পবিত্র আল্লার উদ্দেশ্যে তার অন্তরকে উৎসর্গ করে পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

তবুও কোন সারা শব্দ নাই। রেলিং ধরে দু'জন দাঁড়িয়ে রইলেন।

উপাসনা সমাপ্ত হ'লে—ছদ্মবেশী মারোয়ান বললেন—হজরৎ। আমরা কোন বিশেষ গোপনীয় তত্ত্ব জানাতে এই নিশীথ সময়ে আপনার নিকটে এসেছি।

হোসেন বল্লেন—হে হিতার্থী ভ্রাতৃদ্বয় আপনারা কি তত্ত্ব আমায় দিতে এসেছেন। জগতে ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আমার আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নাই। গোপন তত্ত্ব আমার জানবার দরকার কি? আমি ওসব জানতে মোটেই আগ্রহান্বিত নই।

—আপনি আমাদের কথা শুনলে বুঝতে পারবেন যে আপনার সত্যিই কোন দরকার আছে কি না?

হোসেন আগুন্তুকের কথায় কিঞ্চিৎ নিকটে সরে আসলেন। ভ্রাতৃগণ রাত্রিতে অপরিচিত আগুন্তুকের রওজা মধ্যে আসবার নিয়ম নেই। যদি দরকার বোঝেন তবে বাহির থেকেই আপনাদে রযা বলবার আছে বলে যেতে পারেন।

—আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করলে মনের কথা বলি আপনার দুঃখে দুঃখিত হ'য়েই আমরা ছদ্মবেশে আপনার নিকট এসেছি। এজিদের চক্রান্তে জায়েদা যে কৌশল করে এমাম হাসানকে বিষ পান করিয়েছে আমরা তা জানি। এবং যেরূপ ষড়যন্ত্র করে তারা হত্যা করেছে সে কথা শুনলেও মহাপাপ হয়। আমরা এজিদের চাকর কিন্তু নুরনুবী হজরত মহম্মদের শিষ্য। আপনার ভক্ত। এই গভীর রাতে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের আসার কোন দরকার ছিল না কোন স্বার্থ ছিল না? কোন লাভের আশা আমরা করি না। এজিদ কৌশলে আপনার প্রাণ নিবে তা আমরা

সহ্য করতে পারিনি তাই প্রাণের জ্বালায় ছুটে এসেছি। আমাদের অন্তরে বড়ই লেগেছে। তাই এসেছি।

আগন্তুকের কথায় হোসেন বললেন—প্রাণের চাইতে অধিক ভ্রাতার মৃত্যুর পর আমার আর ভয় বা দুঃখ কিছু নাই। আমার প্রাণের জন্য আমি একেবারে ভয় করি না।

—প্রাণের জন্য আপনার ভয় নাই তা আমরাও জানি! কিন্তু আপনার প্রাণ গেলে আপনার পুত্র কন্যা পরিবার অগ্রজের বিধবা স্ত্রী এদের কথা ভেবেছেন ত? দুরন্ত জালেম এজিদ যে কি করবে তা ধারণাও করা যায় না। আপনার অভাবে এজিদ এদের বেঁধে নিয়ে যাবে দামেস্কেতে তারপর যা হয় তাই হবে।

—তাতে আমি ভীত নই ভাই। তবে এটা আমি জানি আমি বেঁচে থাকতে এজিদ মদিনার কোন একটি স্ত্রীর অঙ্গও স্পর্শ করতে পারবে না।

—সেই জন্যই ত' আপনার শিরচ্ছেদন করবার হুকুম তিনি আগে দিয়েছেন। আজ একা এখানে আপনি থাকবেন না। পাঁচ হাজার যোদ্ধার মধ্যে একা আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনি দয়া করে এ স্থান ত্যাগ করুন। রাত্রি শেষ হ'য়ে এলো আর বিলম্ব নাই এখনই যয়ত' তারা আক্রমণ সুরু করবে। আমরা চললাম শিবিরে আপনি কিন্তু আজ এখানে থাকবেন না। অন্য কোথাও গিয়ে রাত্রি বাস করবেন না।

আগন্তুকের কথায় হেঁসে বল্লেন—ভাই অত ব্যস্ত হ'য়ো না। আমার মরণের জন্য তোমরা মোটেই ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি মাতামহের কাছে শুনেছি দামেস্ক কিম্বা মদিনায় আমার মৃত্যু নাই। আমার মৃত্যুর স্থান "দাস্ত কারবালা" নামক মহাপ্রান্তর। সুতরাং আমার মৃত্যু বিষয়ে কোনই চিন্তা নাই।

—দেখুন আপনার সৈন্য বল অর্থ বল কিছুই ত নাই এজিদ সব দিক দিয়ে বলবান দাস্ত কারবালাতে আপনার প্রাণ বিয়োগ হতে পারে কিন্তু আজই এজিদের হাতে আপনাকে বন্দি হ'তে হবে। মদিনা বাসিরা নানা প্রকার ক্লেশ পাবে। দেরী করবো না আর আমরা। আমরা চল্লাম। আগন্তুক চলে গেল হোসেন ভাবতে লাগলেন এই লোক দু'টো সত্যই পরোপকারী। নইলে নিজের প্রাণত্যাগের জন্য বিন্দুমাত্র ভয় না করে ছুটে এসেছে। আজই যদি রওজা আক্রমণ করে তবে শোকসন্তপ্ত নগরবাসী আর ঠিকমত যুদ্ধ করে উঠতে পারবে কি না কে জানে। তার চাইতে এক কাজ করা ভাল। কিছুদিনের জন্য আপাততঃ কুফা নগরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত। সেখানে জেয়াদ আমার পরম বন্ধু। আরব দেশে যদি প্রকৃত বন্ধু থাকে তবে সেই আমার প্রকৃত সুহৃদ। এমনি নানা প্রকার ভাবনা করতে করতে তিনি আবার ঈশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন। ওদিকে এতদে ওলীদ ও মারোয়াণ শিবিরে এসেই চিন্তিতভাবে এসে আলোচনায় বসলো।

মারোয়াণ বল্লেন মহম্মদের রওজায় হোসেনের মৃত্যু নাই। আমরাও এমন কোন ব্যবস্থা করে আসতে পারি নি যাতে হোসেন আজ রওজা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিবে সুতরাং কাসেদ পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা যাক—বেশী বিস্তার করে চিঠি দেবার আবশ্যক নাই। তাড়াতাড়ি যা হয় লিখে রাখুন।

মারোয়াণ কাসেদকে দিবার জন্য চিঠি লিখতে বসলো। ওতবে অলীদ আবার বললেন—একটি কথাও যেন ভুল না হয় অথচ গোপন ভাবে যেন লিখো।

মারোয়ান পত্র লিখে কাসেদের হাতে দিয়ে বললেন কাসেদ এই নাও পত্র।

—পত্র কাকে দিব?

—যার নাম লেখা আছে তাকে?

—সে যদি না থাকে তবে?

—তবে অপেক্ষা করবে। অন্য কারো হাতে কখনই পত্র দিবে না।

—আজ্ঞা আচ্ছা।

কাসেদ 'কুফা"র চিঠি নিয়ে এগিয়ে চল্ল দ্রুতবেগে। ওলীদ' ঘরের ভিতর এসে বল্ল—এই যুক্তিই ভাল হ'ল। অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। মারোয়ান বল্ল—ঠিক বলেছো। মাথার ভার পাতলা হয়ে এলো এতক্ষণে।

দামেস্ক দরবারের আঘাত—

ক'দিন পর কাসেদ এসে দামেস্ক পৌছিল। চিঠি পড়ে এজিদ কোষাধক্ষ্যকে আদেশ করলেন—এখনই তিন লক্ষ টাকা এবং পাহারা সমেত সৈনিক ও কাসেদকে সঙ্গে করে এখনই কুফাতে রওনা হ'যে যাক। পত্র লিখে দিলেন কাসেদের হাতে।

ভাই আবদুল্লা জেয়াদ—

তোমাকেই আমার এই কাজের জন্য উপযুক্ত লেক মনে করে এ সমস্ত ব্যবস্থা করে পাঠালেম। তুমি তোমার উপযুক্ত বকশিশ পাবে। দামেস্ক রাজ আর আপনাকে অধিন রাজ্য বলে মনে করবেন না। নিজের রাজ্য বলেই স্বীকার করে নিবে। এই মিত্র ব্যবহার যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকবে তত দিন ঠিক একই নিয়মে অক্ষুন্ন থাকবে।

চিঠি নিয়ে কাসেদ অভিবাদন করে চলে গেল। বহু দূরের পথ। প্রায় বিশ দিন পর সৈন্য সামন্ত টাকা নিয়ে কাসেদ এসে কুফা নগরে উপস্থিত হ'লো।

কাসেদ খবর দিলেন।

আবদুল্লা জেহাদ আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বেরিয়ে এলেন কাসেদের নিকট। ব্যাপার কি!

কাসেদ বল্ল—মহারাজ এজিদ অর্থ, সৈন্য ইত্যাদি

পাঠিয়েছেন আর আপনার নামে এই চিঠি দিয়েছেন। বলে চিঠিখানি এগিয়ে দিলেন।

আবদুল্লা আদেশ কল্লেন—এদের সমুচিত সমাদর করে সব ব্যবস্থা করে দাও। পরে কথা শুনবো। চিঠি বার করে আবদুল্লা সব কিছুই অবগত হ'লেন। আবদুল্লা অতিশয় লোভী ও অর্থ পিশাচ।

সে মনে মনে ভাবতে লাগলো—হোসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বতা বজায় রেখে তার লাভ কি। আর এজিদ তাহাকে আজ যা দিতে চেয়েছে তা পেয়ে তার যথেষ্ট কাজ হবে। সুতরাং এজিদের সঙ্গে ভাব রাখাটাই স্বার্থের দিক দিয়ে দরকার বেশী। সুতরাং এজিদের মনই তাকে রক্ষা করতে হবে।

রজনী প্রভাত হ'ল—

স্নীগ্ধ রৌদ্র তাপে সারা দুনিয়া ভরপুর।

আবদুল্লা জোশাদ্ সভাষদগণকে বললেন—গত রজনীতে আমি হজরত মহম্মদ মোস্তাফাকে স্বপ্নে দেখেছি। কালো লাঠি হাতে, শিরে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ। অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ তিনি এসে বললেন—আবদুল্লা জোয়াদ তোমাকে একটি কথা রাখতে হবে—হোসেন ভ্রাতৃহীন হ'য়ে আমার সমাধিক্ষেত্রে দিবারাত্র কাঁদছে তুমি তার পক্ষ অবলম্বন কর। সৈন্য সামন্ত ধনজন দিয়ে হোসেনকে সহায়তা করেন। এরপরই তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ঘরখানি অপূর্ব সুষমাতে আর সুরভিতে ভরে রইল। সে যে কি তৃপ্তি তা মুখে প্রকাশ করে বলা যায় না। তখনি কায়মনে হজরত এমাম হোসেনের প্রতি আত্ম সমর্পণ করলাম। এই রাজ্য, সৈন্যসামন্ত, এই ধনভাণ্ডার, মনিমুক্তা সকলি এমাম হোসেনের। সিংহাসন আজ থেকেই হোসেনকে প্রদান করলাম। আপনারা আজ থেকেই মহামান্য এমাম হোসেনের অধীন হ'লেন।

সর্বত্রই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল।

ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। আবহুল্লা জেহাদ সত্যিই ভগবান বিশ্বাসী বটে।

এত বড় পুণ্যবান এত বড় উদার হৃদয় আর ক'জন আছে।

সকলে আবহুল্লাকে যত বড় ধর্ম্ম পরায়ণ—বলে জানুক না কেন এজিদ ঠিকই সব ব্যাপার জানতে পারলেন।

মারোয়াণ আজ মদিনা আক্রমন করবে। রওজা আক্রমণ করবে। হোসেনের প্রাণ বধ করবে সর্বসাধারণের মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল।

মদিনাবাসিরা হোসেনের পক্ষ হ'য়ে এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

আজ যুদ্ধ হয়……

কাল যুদ্ধ হয়……

প্রতিদিনেই কেবল এই কথাবার্ত্তা। তর্ক বিতর্ক…দিনরাত হোসেনের শুভাকাঙ্খিদের চোখে ঘুম নেই।

সকলেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় কুফার রাজদূত এসে খবর দিল আবদুল্লা জেহাদ তাহাকে রাজ্য ধন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তার নামে অর্পণ করেছেন যাক এবার একটা বড় সহায় হ'লো।

এমাম হোসেন যখন কথাটা শুনলেন তখন তিনিও কুফার যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। বৃথা মদিনায় থেকে যুদ্ধ করে কতকগুলি মদিনাবাসীর প্রাণ বিনাশ করা হবে মাত্র। এজিদের শক্তির সম্মুখে সে একা টিকতে পারবে না।

ক্রমে হোসেন সকলের নিকট কুফা যাওয়ার কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। সকলেই নিরুত্তর রইল।

শেষটায় বিবি সালেমার কাছে গিয়ে হোসেন মত জিজ্ঞাসা করলেন—

ছালেমা বললেন—আবদুল্লা জেয়াদ যাই বলুক আমি তোমাকে কুফায় যেতে মানা করি তুমি কিছুতেই কুফায় যাবে না। হজরতের রওজা ছেড়ে অন্য যে কোন স্থানে গেলেই তোমার অমঙ্গল-হবে। হজরত নিজে আমাকে অনেকদিন বলেছেন যে হোসেন যেন আমার রওজা ছেড়ে অন্য কোথায় কখনও যেন যায় না—

আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করছি। তুমি কখনও রওজার বাইরে যেয়ো না। এখানে থাকলে কেউ তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করতে পারবে না।

—কিন্তু কতকাল আর এমনি করে অকেজো ভাবে বসে থাকা যাবে আরওত' কাজ আছে। একা আমার প্রাণের জন্য হাজার হাজার লোকের প্রাণনাশ করব তা হয়না। আর কুফা নগরের সমস্ত লোকই ধর্ম্ম বিশেষ করে মুসমান ধর্ম্ম-পরায়ণ সেখানে গেলে আমার প্রাণনাশ হবার আর কোন উপায় নাই।

সালেমা—যা ইচ্ছা হয় কর। বৃদ্ধার কথা কিন্তু বাছা শোনাই মঙ্গল ছিল।

এরপর হোসেন এসে তার মাতার সহদোরা ভগ্নির নিকট বল্ল—আমি কুফায় যাব। আপনার-মত আছে ত' ?

—না কুফাতে আমি এ বংশের কাউকে যেতে দিতে বলতে পারি না। তোমার কি মনে নেই তোমার বাবা কুফায় গিয়া কি সমূহ বিপদে প'ড়েছিলেন কুফ নগরবাসী সব শয়তান। তারা তাঁকে কতই না যাতনা দিয়েছে। তুমি সুরনুবী মহাম্মদের রওজায় বসে থাক কোন ভয় নাই।

—কিন্তু আমার মন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছে। তিলমাত্র সময় এখানে আমার আর ভাল লাগছে না। আপনারা আমায় আর বাধা দিবেন না। ঈশ্বর কপালে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তার বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করবার নাই। তবুও এখানে আর থাকা চলে না।

হোসেন যেখানেই বলেন সকলেই তাকে কুফা যেতে বারণ করেন।

বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাস কল্লেই তারা বলে—কেন ছারছো মদিনা।

—ভাল লাগেনা তাই। আর অজস্রলোকের প্রাণনাশ আমার কারণে হবে তাও ভাল মনে করি না।

বন্ধুজন উত্তর দেন—মদিনা বাসিগণ এজিদকে একবার শিক্ষা দিয়া দিয়াছে। এই নগরের একটী লোকের প্রাণ থাকতে এজিদের সাধ্য কি যে তোমার অঙ্গস্পর্শ করে? দেশের স্বাধিনতা, গৌরব রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। আপনি কখনই মদিনা ছারবেন না।

—ভাইগণ এজিদের প্রতিজ্ঞাই হ'ল আমাদের বংশ লোপ করে দেয়া। যে উপায়েই হ'ক এজিদ আমর প্রাণ বিনাশ করবে।

তার অপেক্ষা আবদুল্লা জেয়াদ্ রাজ্য পর্যন্ত আমার নামে অর্পণ করেছে তার কাছে যাওযাই সমীচিন।

—কিন্তু কেন সে রাজ্য দিযেছে তাত' আপনিও জানেন না। লোক মুখে শোনা গেছে এজিদ তিন লক্ষ টাকা সমেত সৈন্য সামন্ত সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে। এ সবের ভেতর অনেক কিন্তু আছে। আপনাকে হঠাৎ রাজ্য দান করল এ সংবাদে আমার যথেষ্ট সান্দহ আছে।

হোসেন বল্লেন—এমন কথা ভাবাও পাপ আবদুল্লা জেহাদের মত বন্ধু জগতে আর দেখা যায় না। তিনি আমার জন্য

এজিদের মুণ্ডপাত পর্যন্ত করতে পারেন। তার উপর আমার নিজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু মান্যবর এমাম হোসেন আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জগতে আপনাদের মত লোক দুইটা ঈশ্বর সৃষ্টি করে পাঠান না। সবাই আপনার মত হ'লো দুনিয়াটাই হ'য়ে যেতো। মানুষের প্রকৃতি ও মতিগতি সব সময় একরকম থাকে না, সময় ও সুবিধার উপর তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তকথা ক'দিন গোপন থাকবে অনুসন্ধান কল্লেই সব ফাঁস হ'য়ে পড়বে।

—হ্যাঁ একথা খুব যুক্তিযুক্ত বটে। তবে এমন সাহসী বিশ্বাসী পুরুষ কে আছে থাকে পাঠান যায়? দ্বিতীয় মোসলেম নামক এক যুবক বলে উঠল—হজরত এমামের যদি অনুমতি হয় তবে এ দাসই যেতে পারে এবং আজ চল্লাম যদি ষড়যন্ত্র থাকে তবে তারা আমায় নিশ্চয় ছাড়বে না। আর যদি যথার্থ হয় তবে হয়ত' ফিরে আসতে পারবো না।

এক বৃদ্ধ বল্লেন—মোসলেমের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে আর যেতে প্রস্তুত তখন মোসলেমই যাক।

—আচ্ছা তবে তাই হোক কিন্তু যদি ষড়যন্ত্র থাকে তবে আমার প্রাণের জন্য অপরের জীবননাশ হবে। সেটা কিরূপ হয়।

—সে ভয় নাই আপনার। কাজ হাসিল করে মোসলেম

অক্ষত শরীরে চলে আসবে। কোন ভয় পাবেন না এমাম সাহেব।

—তুমি যথাসম্ভব চলে আসবে মোসলেম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ দাস কাজ হ'য়ে গেলে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করবে না।

—কতদিন তোমার ফিরে আসতে লাগবে?

—এক মাস। তার বেশী নয়। দূরের পথ ত—

—আচ্ছা যাও কোন ক্ষেত্রেই নিজ প্রাণের ক্ষতিকর কোন বিপদের মধ্যে যাবে না।

—আজ্ঞে আচ্ছা।

—যাও ভাল মত ফিরে এস। ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ। তোমার মঙ্গল হ'ক।

হোসেনের কথায় অভিবাদন করে মোসলেম বেরিয়ে গেল।

মোসলেমের দুই পুত্র চল্ল পিতার সঙ্গে। দুখের সাথী। সুখের সাথী দুই'টী নয়নমণি পিতার সঙ্গে মহা আনন্দে আগে আগে এগিয়ে চল্ল।

এদিকে এতক্ষণে নগরের বুকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অল্পক্ষণ পরেই গভীর কালো ঘনিয়ে আসবে। দিন যায়......

ক্রমে একটি একটি করে অনেক ক'দিন কেটে গেল এমাম

হোসেনের আসার দিন পার হ'য়ে যাচ্ছে দেখে আবহুল্লা চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন।

আবহুল্লা ভাবলেন এমাম হোসেন কি তার মনগত অবস্থা সব জানতে পারলো নাকি!

অসম্ভব বলেও মনে হয় না। যে বংশের সন্তান তাতে মনের কথা যে বুঝতে না পারবে এমন নয়।

সংবাদ নূতন করে দিয়ে পাঠাব না কি তাতে আমার কুমৎলব সহজে ধরা পড়ে যাবে।

বেশী ভক্তি ভাল নয়। শাস্ত্রের কথা কি একেবারে মিথ্যা'! না কি সত্য!·

এমাম নিজে না এসে দূত পাঠালেন কেন! কিছুই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

নানারূপ চিন্তার ভেতর দিয়ে আবহুল্লা মোসলেমকে সভায় ডেকে পাঠালেন।

মোসলেম সভায় এলে জেয়াদ করযোড়ে বলতে আরম্ভ করলেন—দূতবর। বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছাতেই আপনার আগমন হ'যেছে। এ সিংহাসন তাঁহার জন্য শূন্য আছে। রাজকার্য্য বহুদিন থেকেই বন্ধ। প্রজাগণ, সভাস্থ অমাত্যবর্গ সকলেই প্রভুর প্রতীক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন। আমি চিরভৃত্য তাঁরপদ সেবা করবার জন্যই ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি ক'রেছেন। কি দোষে প্রভু এতদিনেও নফরের বাড়িতে পদধূলি দিলেন না।

মোসলেম বল্ল—এমাম হোসেন শীঘ্রই মদিনা পরিত্যাগ করবেন। মদিনাবাসীরা প্রভুকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, তাই তাঁর আসতে একটু দেরী হ'চ্ছে। তাই তিনি আগে থেকেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আবদুল জেয়াদ—আপনি প্রভুর পক্ষ থেকে যখন এসেছেন আমরা আপনাকেই প্রভুর ন্যায় গ্রহণ করবো বলে আবদুল্লা মোসলেমকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজার ন্যায় সেবা করতে লাগলেন।

সকলেই এসে রাজনীতি অনুযায়ী তাকে সেলামী দিয়ে মোসলেমকে সম্মান দেখালেন।

ক্রমে অধীন রাজাগণ এসেও তার নিকট নতশির হ'য়ে সম্পূর্ণ নতভাব দেখিয়ে গেল।

মোসলেম কিছুক্ষণ ভালভাবে রাজকার্য্য চালিয়ে গেলেন।

তার নির্ভিক রাজ্য পরিচালনা দেখে সকলে ত' অবাক!

সকলেই তার আজ্ঞাবাহী আবদুল্লা জেয়াদ ত' সর্বদার জন্য জোর হাতে অপেক্ষা করছে।

মোসলেম প্রনেকরূপে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কই কিছুই ত' তিনি বুঝতে পার্চ্ছেন। না কুফা নগরে সে কুমন্ত্রণা দ্বিতীয় কর্ণে প্রবেশ করে নি। কি করে! মোসলেম মদিনায় লিখে পাঠাল—

হজরত,

নির্ব্বিঘ্নে আমি কুফায় এসে পৌছেছি। রাজা জেয়াদ

সমাদরে আমাকে রাজসম্মান দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছে। কোন কপটতা বুঝতে পাচ্ছি না। নগরের লোকজনও এমামকে খুব ভক্তি করে। আসা না আসা আপনার ইচ্ছা।

ইতি—

মোসলেম।

হোসেন যে সময় পত্রখানি পেলেন তারপর থেকে তার মনে একটা অসম্ভব তৃপ্তি। পুত্রকন্যা ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতৃবধু ইত্যাদি সহকারে তিনি তখন কুফায় রওনা দিলেন।

পথ চলিতে চলিতে প্রতিমুহূর্ত্তেই তার বেশ শঙ্কা বোধ হ'চ্ছিল কোথা থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। আর যদি এজিদের সৈন্যদের নাগালে আসে তবে ত' আর রক্ষা নাই। ভীতভাবে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে এমাম হোসেন পথ চলছেন।

এগার দিন ধরে পথ চলা চলছে তাই মনে হচ্ছিল কুফা বুঝিবা নিকটতম হ'য়ে এসেছে।

আবদুল্লা জেহাদের গুপ্তচররা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তাই কোনদিক হাসান কতদূরে কোনদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সব খবরই দামেস্ক ও কুফায় পৌছোচ্ছে।

প্রভু হোসেন কিন্তু এ সব কিছুরই খবর রাখেন না। কে যে তাকে লক্ষ্য ক'রছে তা তিনি মোটেই বুঝতে পারেন নি।

ওদিকে মোসলেম এসে কুফায় বন্দী হ'য়ে আছে এই বন্দী করা হ'য়েছে কৌশল করে। সৈন্যসামন্ত সমেত এ একেবারে

বন্দীদশার ভেতরে র'য়েছে। মোসলেম সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে চলছিল তলে তলে যে এত আছে তা সে বুঝবে কি করে। আদরে ভুলে সে কোন সন্দেহ করতে পারেনি।

কার মনে কি আছে তা বাইরে থেকে বলাও শক্ত। কার মনে কি আছে কে বলবে।

এদিকে আবদুল্লার গুপ্তচর তাকে এসে সংবাদ দিল যে ছয় হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে হোসেন কুফার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদ পেয়ে আবদুল্লা কাসেদের হাতে একখানি পত্র দিয়ে দামেস্ক পাঠালেন।

বাদশা নামদার।

আমি বহু কষ্টে হাসানকে রওজা থেকে বের করে কুফার দিকে নিয়ে এসেছি।

আপনারা এই সময় হোসেনকে কারবালার পথে অনুসন্ধান করুন।

এই কারবালার প্রান্তরে তাকে আক্রমণ না করাতে পারলেও ফুরাত নদীর কূলে পূর্বদিক অবরোধ করে অগ্রেই বসে থাকবেন।

হোসেন ৬ হাজার লোক সমেত রওনা হ'য়েছে। সঙ্গে যা খাবার আছে তাতে পথ হয় ত' অতিক্রম হ'য়ে যাবে কিন্তু পানীয় জলের অভাব তাদের নিশ্চয়ই হবে। সেই জন্য খুব সাবধানে ফুরাত নদীর কূলে বরাবর সৈন্যরা যেন পাহারা দেয়

যাতে কেউ নদীতে জল নিতে না আসতে পারে। এলেও যাতে এক গ্রাস জলও কেউ না পায়।

চিঠি পেয়ে এজিদ নামদার আবার তার উত্তর দিলেন— আমি সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক মত করিয়া দিলেম। হোসেনের মস্তক যে আমার নিকট আনিয়া দিবে তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিব।

প্রধান সৈন্যগণ বলাবলি আরম্ভ করল এবার হোসেনের মাথা না নিয়ে আর দামেস্ক আসবো না। ওমর, সীমার ত' আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে গেছে। বাপরে বাপ এক লক্ষ টাকা, যেমন ক'রেই হ'ক হোসেনের মাথা কেটে আনতেই হবে।

এজিদ বল্লেন—পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট রইল, বলে এজিদ সৈন্যদের নগরের বাহিরে দিয়ে এলেন।

সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে, ঝড়ের বেগে। বিশ্রাম নাই আহার নাই নিদ্রা নাই সৈন্যগণ অবিশ্রান্ত চলে যাচ্ছে।

চলতে চলতে তারা এসে কুফায় পৌছিল। সংবাদ পেয়ে আবদুল্লা জেয়াদ মোসলেমের নিকট গিয়ে করযোরে বল্লেন— বাদশা নামদার এজিদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর মারোয়ান এবং ওত্‌বে ওলীদ কুফার অতি নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে মনে হয় অদ্যই নগর আক্রমণ করবে।

প্রভু হোসেনের আশায় এতদিন রইলাম। তিনিও এলেন না এতদিন; এখন কি করা দরকার। আদেশ করুণ—ঠিক

আছে কোন ভয় নাই আমি নিজে এখনই এজিদের সৈন্তদের সৈন্ত সামন্ত নিয়ে যেয়ে বাধা দিব।

—কিন্তু শত্রু একেবারে দোর গোরায়।

—তার জন্য কোন ভয় বা শঙ্কা নাই। আমার সৈন্ত খুব সাহসী ও বীর যোদ্ধা কোন ভয় না থাকলেই ভাল।

মোসলেমের সঙ্গে আবদুল্লা জেয়াদের কথা শুনে এজিদের সৈন্যগণ অবাক হ'য়ে গেল।

জেয়াদের মনে এত চাতুরী...এত রসিকতা—এদিকে ওত্‌বে ওলীদ মোসলেমকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—আক্রমণ কর।

কুফার সৈন্ত কত আছে মোসলেন তা দেখতে গেলেন।

সৈন্ত দেখতে গিয়ে তিনি যা দেখলেম তাতে তার মাথা ঘুরে উঠল। একজন প্রাণীও নাই। ওদিকে নগর তোরণ বাহির থেকে বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে।

মোসলেম এতক্ষণে টের পেলেন জেয়াদের মনে অনেক কিছু কুটিলতা ছিল। তাই কায়দা করে এসব ব্যবস্থা করেছে। প্রভু হোসেন এলে ত' ভারী বিপদ হ'ত।

যাক কুফার এলে তাঁর মাথা কাটা যেত' সে দণ্ড তাকেই এখন ভোগ করতে হবে।

মোসলেমের প্রাণ যেয়েও যদি প্রভুর প্রাণ রক্ষণ হয় তবে তাও ভাল।

এমন সময় মহাবীর অলীব ঘরে প্রবেশ করে বল্ল মোসলেম

যদি নিতান্তই যুদ্ধ সাধ হ'য়ে থাকে তবে এস আমরা দু'জনেই যুদ্ধ করি। জয় পরাজয় যার যার ভাগ্যের বাহন।

অযথা অন্য প্রাণ নষ্ট করে কি হবে?

মোসলেম কোন কথা না বলে কতক সৈন্যের সঙ্গে ওলীদকে ঘিরে ফেললো।

ওলীদবল্ল—মোসলেম এই কি বীরের রীতি?

—কে তোমাকে বীর বলে?

—ভ্রাতৃগণ বিধর্ম্মীর হাতে মৃত্যুই শ্রেয়। প্রভুর বংশধরগণকে যারা নিধন করতে চায় এস তাদের আজ জাহান্নমে পাঠাই।

—কি বল্লি দুরাচার।

—আরে নরাধম তোদের শাস্তি পশুর মত করে বধ করা। দেখ আর কতক্ষণ তোদেয় দেহে মাথা থাকে।

—বন্দি মোসলেম। এখনও তোমার আস্ফালন গেল না আচ্ছা দেখি।

—দেখবি কিরে পাপিষ্ঠ আজ আর তোর রক্ষা নাই।

—সৈন্যগণ আক্রমণ কর এই পাপাচারকে।

—সাবধান ওলীদ!

—আক্রমণ কর। কোন ভয় নেই।

—ওরে পাপিষ্ঠ তোর এত বড় সাহস তবে দেখ মোসলেমের অসির কতখানি ধার আছে। নরমুণ্ড ছেদন করতে কতখানি তার সময় লাগে। বলে মোসলেম ওলীদের উপর ঝাঁপিয়ে

পরলো। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো মোসলেম ও ওলীদের সঙ্গে। সে কি ভয়ানক যুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থা থেকেই মোসলেম ও তাহার অনুচরবর্গ ভয়ানক ভাবে ওলীদকে আক্রমণ করল।

চোক্ষের নিমেষে শত শত নর মুণ্ড ধূলিতে গড়াগরি; ওলীদ ত' ব্যতিব্যস্ত।

পূর্বে ওলিদের ধারনা ছিল না যে মোসলেম কি প্রকারের যোদ্ধা। এখন সমর ক্ষেত্রে তা পরীক্ষা হ'তে আরম্ভ হ'ল।

ওলীদ যুদ্ধের কায়াদায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কিছুতেই আর টিকতে পারে না।

কি করা। উঃ। মোসলেন কি ভয়ানক যোদ্ধা। ওলীদ আর পেরে উঠছে না।

আবহুল্লা উপর থেকে সবই দেখছিলেন। ওলীদের তুরাবস্থা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন—প্রহরী দরজা খুলে দাও আমাদের সৈন্য আসুক নইলে মহাবীর ওলীদের খুবই মুস্কিল নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে। সৈন্যগণ ওলীদকে সাহায্য কর··· এগিয়ে এস।

—কিরে পাপাচার দেখলি তোর কত দূর শক্তি। কোথায় গেল তোর সৈন্য সামন্ত। কোথায় তোর বাক্ চাতুরি? এমন সময় প্রহরী তোরণ দার খুলে দিল। আর প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য সঙ্গে করে আবহুল্লা এসে হুড় হুড় করে ভিতরে ঝাপিয়ে পরলো।

এবারে মোসলেমের পক্ষে টিকে থাকা ভারী মুস্কিল একা সামান্য ক'জন সৈন্য আর মোসলেম। একা সে আর কতদূর কি করতে পারে। সহস্রভাবে চেষ্টা করেও মোসলেন ঠিক কুল পেয়ে উঠছিল না।

ধীরে ধীরে লক্ষাধিক সৈন্যের আক্রমনে মোসলেম ও তার সঙ্গিগণ অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলো।

সর্ব শরীর দিয়ে রক্ত ঝড় ঝড় করে বয়ে যাচ্ছে তবুও তার সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

কিন্তু লক্ষাধিক সৈন্যের আক্রমণে মোসলেম টিকবে কি করে। ক্রমে মোসলেমের পক্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ থাকলো না।

সুযোগ বুঝে আবদুল্লার লক্ষাধিক সৈন্য মিলে মোসলেমকে অতিষ্ঠ করে উঠিয়ে শেষটায় তার শীর দ্বিখণ্ডিত করে ফেল্ল।

তারপর খোঁজ পর'লো মোসলেমে বালক পুত্রদ্বয়ের। কোথায় গেল সেই অবোধ বালক দ্বয়!

নূতন দেশ—নূতন রাস্তা নূতন সব কিছু।

তবুও বালকদ্বয় প্রাণভয়ে এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। কখন পালিয়েছে তা কেউ দেখতে পায় নি।

মোসলেমকে হত্যা করে সবাই রে রে করে বেরিয়ে পল্ল বালকদ্বয়ের খোজে।

পাষাণ…পাষাণ।

দুগ্ধপোষ্য কুমারের প্রাণ নাশের জন্য এত চেষ্টা কেন! নরকেও ত' এদের কোন স্থান নেই।

শুধু হত্যা নয় শূলে চড়িয়ে তার মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে। তারও রক্ষা নাই।

—ঢোল সহরই দিতে এখনই লোক বেরিয়ে যাবে জাহাপানা কোন চিন্তা করবে না বালকদ্বয় ধরা পরলো বলে।

—ধরা না পল্লে কারো রক্ষা নাই বালকদ্বয়ের কারণেই বহু লোকের মৃত্যু আমি ডেকে আনবো।

আবদুল্লা জেযাদের আদেশ মত সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা প্রচারিত হলো অনেকেই অর্থ লোভে পিতৃহীন বালকদ্বয়কে অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগলো।

ওদিকে ঘোষণা প্রচারের পূর্ব্বেই অসহায় বালকদ্বয় একজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

যার বাসায় তারা আশ্রয় পেলো সে কুফা নগরের একজন কাজি।

তিনি বালকদ্বয়ের দুঃখে দুঃখি হ'য়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

বেশ যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে তাদের শয়নের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কি যে কল্লেন!

কি ক'রেন এই অবোধ শিশুদ্বয়কে নিয়ে।

কাজি সাহেব বিচারক হ'য়ে মহা চিন্তিত হ,য়ে পড়লেন।

অনেক চিন্তার পর ডাকলেন পুত্রকে—পুত্র এই অবোধ শিশু দু'টোর প্রাণ রক্ষার উপায় কি ?

মোসলেম হত হ'লে একজন আবদুল্লা জেয়াদকে বল্লেন—ধর্ম্মাবতার মোসলেমের পুত্র দুটী মারা যায় নি। তারা গেল কোথায় ?

—কোথাও বন্দি হয় নি ?

—আজ্ঞে না জাহাপানা।

—অবোধ কিন্তু তারা পালাবে কোথায়।

—পালালেও রক্ষা নাই। যাবে কত দূর ?

—কি করে এত সৈন্য সংখ্যাকে ফাকি দিল বালকদ্বয় পালিয়ে গেল তোমরা কেউ তা লক্ষ করো নি।

—সে হ'য়ত' এ পর্য্যন্ত আর বেঁচে নেই।

—বালকদ্বয় নিশ্চয়ই কোথাও আত্ম গোপন করে আছে। পালাবে কোথায় ?

—মহারাজ বালকদ্বয় সহরের মধ্যে-ই আছে। পালাবে আর কোথায়। আমরা খবর পেয়েছি।

—সে কি কথা মোসলেমের পুত্রদ্বয় এখনও বেঁচে আছে। একি ভয়ানক কথা।

—নগরের সমস্ত পথ ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে খোজ করা হ'চ্ছে জাহাপানা।

—ডঙ্কা, দুন্দুভি, বাজিয়ে সকলকে জানিয়ে দাও যে

মোসলেমের পুত্রদ্বয়রের মাথা এনে দিতে পারবে তাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিব।

—যদি কোন ব্যক্তি শিশুদের আশ্রয় দেয়?

—তাকেও হত্যা করা হবে।

—আচ্ছা পিতা রাত্রিতে যে সব লোক চলা চল করে সেই কাফেলায় মিশিয়ে দিলে বালক দ্বয় হয়ত মদিনায় যেতে পারবে।

—হ্যা তা ঠিক বলেছ। তাহলে তোমরা দুভাই টাকা সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।

বলে তিনি খাদ্য সামগ্রী ও টাকা সঙ্গে দিয়ে দুইপুত্রকে রওনা করে দিলেন।

কাজি সাহেবের পুত্র আসাদ বালক দ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পরল রাজপথে।

নিস্তব্ধ রজনী! নগরের কোলাহল স্থির নিস্তব্ধ হ'য়ে আসছে। ঝিম ঝিম করছে রাতের প্রকৃতি সাড়া নাই, শব্দ নাই সব নির্বিকার...

রাস্তায় বেড়িয়েই দেখলেন একদল যাত্রী মদিনায় যাচ্ছে। অনেকটা দূরে তারা।

আসাদ বললেন ভাই গণ দেখছো ঐ মদিনার যাত্রী দেখা যাচ্ছে। এমন সুযোগ আর মিলবেনা তোমরা খোদা-তাল্লার নাম করে ঐ দলে মিশে যাও।

ওর ভেতর প্রবেশ করতে পারলে আর কোন ভয়

নাই তোমাদের এলাহির হাতে স'পে দিচ্ছি। শীঘ্র যাও সেলাম···সেলাম···

আসাদ বিদায় হ'য়ে গেল···

ভগবানের ইচ্ছা কেহই বুঝতে পারে না।

কিছুদূর গিয়ে বালকদ্বয় তাদের পথ হারিয়ে ফেল্ল। তারা মদিনার পথ ছেড়ে আবার চলল কুফার দিকে। মনে ভাবল যাত্রীদল বেশী দূর যায় নাই এখনই আবার গিয়ে তাদের সাথ ধরা যাবে।

আশা অনেক করা যায় কিন্তু পূরণ হয় না সব আশার। এগিয়ে চলতে চলতে তারা দেখতে পেলেন অদূরে এক, মশালের আলো।

আলো লক্ষ্য করে তারা চলতে লাগলেন। যেয়ে দেখলো ও-আলো যাত্রী দলের নয়। রাজ প্রহরীর। অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত। সবার হাতেই এক একটি জলন্ত মশাল।

বালকদের দেখতে পেয়েই তারা সব কিছু বুঝতে পারলেন।

আর কি রক্ষা আছে!

ভয় যেখানে রাত্রিও সেই খানেই এসে ঘনিয়ে আসে। একজন এসে তাদের ধরে ফেল্ল।

পুরস্কার লোভে নগরপাল, কোটাল ছুটি শিশুকে এ'টে ধরলেন কোথায় যাস্ পামর।

বালকের হৃদয় কেঁপে উঠল।

এ কার হাতে তারা ধরা প'রেছ। বালকদ্বয় ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

উঃ! ভয়ে বালকের মুখখানা এতটুকু হ'য়ে গেছে। কি করবে তারা। আর ত' রক্ষা নাই।

এদিকে বালকদ্বয়ের সুন্দর দেহ দেখে নগর পালের একটুকও দয়া হ'লো না।

মনে মনে তিনি ভাবলেন আজকের রাতের মত নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া যাক্। প্রভাত হ'লে রাজ দরবারে হাজির করা যাবে মনে মনে তাই ভাবলেন।

কুফাধিপতি মোসলেম তনয় দ্বয়ের রূপ লাবণ্য মুখশ্রী দেখে শিরচ্ছেদ করা কথাটা আর মুখে আনতে সাহস করলেন না। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত হাজত বাস করবার হুকুম প্রদান করলেন।

আবদুল্লা জেয়াদ দূতকে খবর দিলো—দূত এই শিশুগণ রাজবন্দী। এদের নিয়ে যাও। বন্দীখানায় রেখে দাও। যেন না পালায় সর্বদার জন্য লক্ষ্য রেখো। সাবধান থেকো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে মোসলেমের পুত্রদ্বয় ত' অবাক হ'য়ে গেছে। এ কি এদের নিয়ে এরা এত ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছে কেন।

কি হ'য়েছে এদের...

কারা গৃহে গিয়ে সেখানেও সেই একই অবস্থা। সকলেই

এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে সকলেই এসে বালকদ্বয়ের কাছে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

রূপ লাবণ্য দেখে কারাগৃহের লোকজন ত' মোহিত হ'য়ে পরেছে। জগতে অনেক রূপবান বালক দেখেছে বটে কিন্তু এমন আর দু'টী দেখেন নি কেউ। কারা রক্ষক মনে মনে ভাবতে লাগলো। কি করে এদের রক্ষা করবো।

কারা রক্ষক বালকদ্বয় কে বন্দী শালায় না রেখে তাদের নিয়ে নিজ গৃহে গিয়ে হাজির হ'ল।

গৃহে গিয়ে ভালভাবে আহার করিয়ে সুন্দর শয্যা পেতে দিল—ঘুমাও তোমরা। কোন ভয় নেই তোমাকে আমি প্রাণ থাকতেও রাজার হাতে দিতে পারবো না।

—আমাদের কি করবেন আপনারা ?

—কেন সে কথা।

—তাই ভাবছি।

—কোনো ভয় নাই। তোমরা ঘুমোও আমি দেখি কি করে তোমাদের রক্ষা করতে পারি।

বলে কারা রক্ষক ব্যস্ত ভাবে চারিদিক ছুটাছুটী আরম্ভ কল্ল।

ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে। তাঁর ইচ্ছা বোঝা যায় না। ভগবান এই শিশু দু'টোকে নিয়ে তুমি কি করতে চাইছ ত' এদের প্রাণ নাশ করিয়ে তোমার হবে কি। এদের রক্ষা কর—রক্ষা কর পরম পিতা। আমি এদের হত্যার সাহায্য

করতে পারবো না আমি এদের মরনের সাক্ষী হ'তে রাজী নই। আমাকে রেহাই দিন···

রক্ষা কর প্রভু···

রাত্রি গভীর।

প্রকৃতি নিস্তব্ধ ··নির্ঝুম···

কোন সারা নাই, শব্দ নাই তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতি রি রি ঝিঁ ঝিঁ করছে। কোন প্রাণী জাগ্রত আছে কিনা তার কোন লক্ষণ নাই।

রাত্রি আরও গভীর থেকে গভীর হ'তে আরম্ভ হ'লো কারা প্রহরী শঙ্কিত কণ্ঠে বালকদ্বয়কে ডেকে বললেন—

—তোমরা একটু তাড়াতাড়ি চলে কুদসীয়া নগরে যেতে পারবে? ঐ নগরে আমার ভাই থাকে তার নাম বলে দিচ্ছি। নাম মনে করে রেখো।

—নাম বল্লেই বাড়ি পাব?

—হ্যা পাবে বই কি কোন মানুষ কে জিজ্ঞাসা করো বাড়ি কোথায়, তাহ'লেই বলে দেবে—

—আচ্ছা কিন্তু তিনি কি আমাদের আশ্রয় দিবেন—

—হ্যা নিশ্চয়ই আশ্রয় দিবেন। আর এই নাও আমার আংটী এই আংটী দেখলেই সে টের পাবে যে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।

—আচ্ছা আংটী দিন।

—কিন্তু খুব সাবধানে আংটী রাখবে।

—আংটী কি করবো ?

—আংটী আমার ভাইকে দেবে তাহ'লেই সে তোমাদের ব্যবস্থা করে দিবে। মদিনার নাম করো তা হ'লেই সে তোমাদের মদিনায় পৌঁছে দেবে।

—আজ্ঞে আচ্ছা।

—এই নাও বালক আমার আংটী। খোদার-নাম গান কর মনে মনে। কোন ভয় নেই।

অঙ্গুরী নিয়ে বালকদ্বয় আবার রওনা হ'লো কুদসীয়ার পথে।

সমস্ত রাত চলতে চলতে বালকেরা অতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। পা যে আর চলে না। সর্ব শরীর অবসন্ন হ'য়ে আসছে। শরীর যেন ছেড়ে দিচ্ছে সারা রাত অবিশ্রান্ত পথ চলার অবসাদে।

বালকদের ভিতর যে বড় ভাই সে বল্ল—ভাই বহু দূরে এসে প'রেছি। এইটাই কুদসিয়া নগর।

—আচ্ছা তবে আর ভয় কি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।

বলে তারা বিশ্রাম করতে লাগলো।

পথের পরিশ্রমে ক্লান্তি এত যে পা আর চলিতে চায় না। বসলে আর উঠতে পারে না। শক্তি যেন নিশেষিত হ'য়ে গেছে।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হ'ল। চারিদিক আলোয় ভরপুর এতক্ষণে বালকদ্বয় বুঝতে পাল্ল এ কসদিয়া নয় এ কুফা।

সারা রাত পথ ভুল করে তারা কুফার রাজ পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।

সর্বনাশ!...

এখন উপায়...মুহূর্তে প্রাণ চমকিয়ে উঠলো। আর বুঝি রক্ষা নাই এখনই ধরা পড়ে যেতে হবে। আমাদের যে স্থানে এনে কুদসিয়া যেতে বলেছিলেন এই ত' সেই স্থান। হায়! হায়! কি করা যায় এখন ত' আর রক্ষা নাই।

বড় ভাইয়ের কথায় কনিষ্ঠ চমকিয়া উঠলো। হ্যাঁ ভাই তাইত' আমরা কাল রাতে যেখান থেকে রওনা হ'য়েছিলাম এত সেই পথ।

দুটী ভাইএর মধ্যে বড়টার নাম মহম্মদ ছোটটীর নাম এব্রাহিম বড়ভাই বল্ল—ভাই এখন কি করা হ'বে। এবারে আর বাঁচবার উপায় নাই। একবার নয় বার বার ভুল আর রক্ষা নাই।

জেষ্ঠের কথায় ছোটভাই বললেন—ভাই ক্রমেই দিনের আলো পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে। প্রকাশ্য পথে আর বসিয়া থাকা সঙ্গত নয়। চল ঐ দূরের খোরমা বাগানে ওর ভেতর গিয়ে লুকিয়ে থাকি তাহলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কোন রকমে দিনটা কাটাতে পারলে রাতের অন্ধকার আবার আমরা পথ চলতে পারবো। সন্ধ্যার পর আবার আমরা মদিনার পথ ধরবো।

মহম্মদ বল্ল—সেই ভাল। আর দেরী করে লাভ নেই ওঠ, বেড়িয়ে পড়া যাক।

বলে দুইভাইয়ে গিয়ে খোরমা বাগানে প্রবেশ কল্ল। ছোট বড় অসংখ্য খোরমা গাছ। ফল ভারে ঝম্ ঝম্ করছে।

এ গাছ সে গাছ করতে করতে একটা বৃদ্ধ গাছের কোটরের ভেতর এসে দু'জনে প্রবেশ কল্ল। জড়োসরো অবস্থায় ভিতরে জরাজরী করে দু'ভাই প্রাণ ভয়ে রাতের অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু ভাগ্য বিরম্বনা। একদিকে সে ফাঁক থেকে গেল সে দিকে কারোই লক্ষ্য নাই। যে সকল বৃক্ষের ছায়া নাহারের জলে পড়ে ভাসছিল।

সেই ছায়ার জলে এসে তরঙ্গাঘাতে আয়নার মত স্বচ্ছ হ'য়ে উঠছিল।

বাগানের একদিকে একটা লোক বাস করতেন। সহরের জল নিতে এসে হঠাৎ গাছের ছায়ার দিকে তার দৃষ্টি পল্ল—ওকি! ভূত নয় ত'! মানুষের মত যেন লাগছে। মনের সংসয় মনে চাপিয়া রাখিয়া লাভ কি। নারীটি আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো।

শেষটায় তার সংসয় যাত্রা সত্যে এসে রূপ পরিগ্রহ করলো।

একি! দুইটা নধর কান্তি বালক জরাজরি ভাবে বৃক্ষকোটরে

লুকিয়ে রয়েছে। কিসের ভয়ে এদের এই দুরাবস্থা। আহা! কাদের ছেলে গো—এমন ভাবে প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে আছে।

পরিচারিকা বল্ল—কে তোমরা বাছা? এমন প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে রয়েছ? তোমার কি কোন ভয় নাই? কার ভয়ে তোমরা গালাগালি ধরে এমন করে কাদছো বল আমার কাছে। কোন ভয় নাই।

কথা শুনে বালকদ্বয় আরও বেশী কাঁদতে লাগলো ভয়ে তাদের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। বালকদের ভয় দেখে পরিচারিকা আবার বল্ল—তোমরা কি মদিনার মোসলেমের পুত্র। তাই বুঝি হবে।

কোন ভয় নাই আমি তোদের কথা কাউকেউ বলব না আমি খুব সাবধান মত রাখবো। রাজ বাড়ির ঢোল শহবৎ শুনেছি। সে জন্য আমার কোন ভয় নেই। চল বাবা আমি তোমাদের খুব সাবধানে রাখবো।

বালকদিগের কথা কুফা নগরে কেউ না জানে এমন নয়। যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয় তবে তাকে শূলে চড়ান হবে।

আর ধরে দ্বিতে পারলে পাবে সহস্র মুদ্রা মহিলা বললেন—বাবা তোমরা 'এতিম' তোদের উপর দয়া করলে তার ভাল বই মন্দ হবে না। চল বাবা আমি তোমাদের মা মনে করে

আমার সঙ্গে নির্ভয়ে চল। আমি বেঁচে থাকতে আর কোন ভয় নাই।

বলে মহিলা বালক দু'টাকে নিয়ে গিয়ে একটা নির্জন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাড়ির শেষ সীমানায় লোক সমাগমের বাইরে এই প'রো ঘড়টি।

সাধারণতঃ এ ঘরের দিকে বিশেষ কোন লোকজন চলা ফেরা করে না।

ঘরের ভিতর শয্যা করে দিয়ে পরিচারিকা বল্ল—বাবা তোমরা ঘুমাও। বিশ্রাম কর; কোন ভয় নাই। আমি তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। কোন ভয় নাই।

যাবার সময় ঘুরে এসে পরিচারিকা আবার বল্‌লেন—দেখ তোমরা চুপ করে থেকো। কোন কথাবার্ত্তা বলো না কিন্তু। শব্দ পেলে বিপদ হবে।

আচ্ছা আপনার কোন ভয় নাই। আমরা চুপ করেই থাকবো। আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।

বাড়ির গৃহিনী খুবই দয়াবতী ছিলেন। তিনি পরিচারিকার নিকট থেকে সব কিছু শুনে বল্‌লেন—আহা কি বিপদ। এমন অবস্থায় কচি মুখে কি ভীত হ'য়ে পরেছ।

—হাঁ সে কি ভাব। আমার প্রথম দেখেত' খুবই মায়া বোধ হ'লো। তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—বেশ ক'রেছ কিন্তু তারপর—

—তার পর একথা আর কাউকে জানান হবে না। তাই সেই ক্ষতি হবে না।

—হ্যাঁ খুব সাবধান। ধরা পরলে কি শাস্তি তা জান?

হ্যা তা জানি। আপনার কোন ভয় নাই। আমি সব দিক লক্ষ্য রেখেই লুকিয়ে রাখছি।

যার বাড়িতে বালকেরা স্থান পেলো সেই বাড়ির মালীকের নাম হারেস।

যে সময় এই ব্যাপার ঘটল সে সময় তিনি বাড়ি ছিলেন না।

কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তার বাড়িতে বালক আশ্রয় পেলেও সে কিন্তু এ সব কিছু জানতে পারলো না।

তবুও আর গৃহেই অসহায় দুই বালক মরণের হাত থেকে আশ্রয় লাভ কোরল।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল।

তবুও হারেস বাড়িতে আসে না। এত দেরী কিসের? বাড়ীর গৃহিনী মহা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন এই অহেতুক দেরীর জন্য।

রাত্রি আরও বাড়লো।

এমন সময় হারেস হাপাতে হাপাতে এসে বাড়িতে উপস্থিত।

ব্যাপার কি!

গৃহিনী চিন্তিত ভাবে বল্লেন—আসতে এত দেরী হ'লো কেন? আমিত, মহা চিন্তায় পড়েছিলাম।

গৃহিনীর কথায় দীর্ঘশ্বাস ছেরে হারেস বল্ল—কি আর বলবো তোমাকে। আমার কপাল পোড়া। নইলে এত খোঁজ করেছি তাও পেলাম না।

কি খোঁজ করলে?

সে কথা আর বলে লাভ কি। পেলে তবে লাভ ছিল

আচ্ছা বলই না ব্যাপার কি?

সারাটি দিন কত গলি, কত রাস্তা, বন বাগান প্রান্তর খুজে একশেষ হ'য়ে গেলাম তবুও এ কপালে মিল্লনা। আমি না পেলেও একজনের কপালে এ সৌভাগ্য মিলবেই।

কি সৌভাগ্য। সেটা ত' বলছ না?

অলক্ষ্মী আমি আমার জন্য এ সুযোগ আসবে কেন। সারাটা দিন অনাহারে বৃথাই খুজে মরলাম ফল কিন্তু কিছুই ফল্ল না।

—কি আর বলব আমাদের বাদসা জেয়াদ মদিনার হজরত হোসেনকে প্রাণ সংহার করবার চেষ্টা করে মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা রাজ্যদান ভান করে মোসলেমকে হত্যা করেছে।

—সে কথা আমরা জানি। আগে মোসলেমকে নিয়ে এলো এবং কৌশলে করে তাকে হত্যা করল।

—তবে ত' তুমি সবই জান দেখছি।

—এই কথা শুনবার জন্য তোমার সারাদিন্ন গেছে?

—আরে না না মোসলেম মরেছে ত' আমার কি?

—তবে এত হাপাচ্ছ কেন?

—হাপাচ্ছি অন্য কারণ আছে।

—সেই কারণ জিজ্ঞাসাই করছি এতক্ষণ? তুমি অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ে বকে মরছ।

—আরে সেই মোসলেমের দুই পুত্রইত' পালিয়েছে তাদের জন্য রাজ সরকার থেকে ঘোষণা হ'য়েছে ধরে দিতে পারলে এক হাজার মোহর পুরস্কার।

প্রথম সহর কোতালের হাতে ধরা প'রেছিল, এবং রাজ দরবারে নিয়ে যাবার পর তাদের সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে হুজুর তাদের মাথা কাটবার হুকুম দিতে পারেন না।

বন্দীশালার কর্ম্মচারী তার কচিমুখ আর রূপ দেখে ছেড়ে দেয়। তখন বাদশাহ কর্ম্মচারীকে শিরশ্চেদ করবার হুকুম হ'য়েছে যে ধরে দিতে পারবে তাকে ৫ হাজার মুদ্রা পুরস্কার দেবেন। আর যে তাকে আশ্রয় দেবে তারও শিরচ্ছেদ হুকুম হবে।

আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সারা দিনটা কোথায় না সন্ধান করেছি। কোন রকমে বাদশার দরবারে হাজির করতে পাল্লেই হ'লো।

যে পাবে সে কে কতকাল ঘরে বসে খাবে তার ঠিক ঠিকানা নাই কিছু। কত যে খোজ করেছি। শেষটায় আমারই খোরমা বাগানে এসে তন্ন তন্ন করে খুজেছি।

প্রতিটি গাছের গোড়ায় গোড়ায় খোজ করেছি। কোথায় খোঁজ নাই।

আশ্চর্য্য ব্যাপার পালাল কোথায় !

এতটুকু শিশু হু'টো, কি করে পালাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে। নিশ্চয়ই আশ পাশে কোথাও আছে। গৃহিণী বল্ল হায় হায় সেই শিশু দুটীকে ধরে জল্লাদের হাতে দেবে সামান্য টাকার লোভে ?

—কেন দেব না কে আমায় টাকা দেয়। টাকার জন্য আমি কেন যে পাবে সেই দিয়ে আসবে।

—অন্যে দিয়ে আসুক তুমি দিতে পারবে না। শিশুর প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা তোমার আনবার কোন দরকার নেই।

—নিশ্চয়ই দরকার আছে।

—কিছুতেই তা হ'তে পারবে না। রক্ত মাখা টাকা আমাদের কোন দরকার নাই।

—তুমি কি বুঝবে ?

—আমি বেশ বুঝি। তুমি কিছুতেই এ পাপ কাজ করতে পারবে না। এ কাজ তোমার করা ভাল নয় তোমারও ত' হু'টো ছেলে আছে তাদের যদি কেউ এমনি করে তখন তোমার কেমন বোধহয়। ঐ শিশুদের মাতৃ হৃদয়কেও ঠিক তেমনি আঘাৎ লাগবে।

—আঘাৎ জীবনে বহুলাগে। মানুষকে ওমন কত আঘাত সহ্য করতে হয়। এই সংসারই চুরান্ত আঘাতের স্থান।

—দেখো আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না, বাধা দিতেও

চাচ্ছি না। কেবল আমার একটি মাত্র মিনতি তুমি দয়া করে একাজটী করতে পারবে না।

—তা কি হয়। মেয়ে লোকের পরামর্শ নিয়ে রাজকাজ চলে না।

—টাকা জীবনে ক'দিন। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট গিয়ে কি বলবে। আমি তোমাকে হাতধরে অনুরোধ করছি তুমি মহাপাপে লিপ্ত হ'য়ো না।

ওসব বাজে কথা ছেরে দাও। খাবার আন দেখি বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

হারেসের কথায় তাহার স্ত্রী আহার আনিতে গেল কিন্তু তার মনে বিন্দু মাত্র স্বস্তি নাই।

এদিকে হারেসের মাথায় নিয়তের জন্য ঐ একই কথা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ হাজার মুদ্রা সোজা নয় বহু দিনের খরচ চলিবে। এ কি ছাড়া যায়।

অসম্ভব অসম্ভব তা কখনও হইতে পারে না। আহার করবার পর স্বামী নিদ্রা মগ্ন হলেন।

গৃহিণী চিন্তা করতে লাগলেন কি উপায়ে বালকদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করা যায়। একমাত্র দাসী জানে তা ভিন্ন আর কেউ নয়।

কি করবে সে এখন। ভাবনায় তার সারা অঙ্গ শীতল হ'য়ে আসছিল।

অনেক চিন্তা করবার পর হারেসের স্ত্রী তার দুই পুত্রকে ডেকে পাঠালেন নিভৃতে।

এই পুত্র দুইটীর ভিতর একজন তার গর্ভজাত অপর টি পালিত।

নিজের গর্ভজাত পুত্র খানিকটা পিতার স্বভাব পেতে পারে। যদিও সে মায়ের খুব বাধ্য ছিল। অপর পালিত পুত্রটী মা বলিতে অজ্ঞান। কখনও মায়ের অবাধ্য হয় না।

তাই সাহসের উপর ভর করে মা পুত্র দু'টীকে ডেকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। বাবা তোমরা দু'জনেই আমার কাছে একই রকমের। কেউ কম বেশী নও। সমস্তই শুনলে এখন কি করে এদের প্রাণ রক্ষা হ'বে তাই ভেবে চিন্তে ঠিক কর। এদের রক্ষা করতেই হবে তাতে আর যা হয় হোক।

—আপনি ভয় পাবেন না। আমরা পিতার অভিপ্রায় শুনে খুবই দুঃখিত হ'য়েছি। আপনার ভয় নাই অদ্যই গভীর রাত্রিতে আমরা দুই ভাই বালকদ্বয়কে নিয়ে মদিনার পথে দিয়ে আসব। কোন ভয় পাবেন না।

—যদি তোমার পিতা জানে ?

—কি করে জানতে পাবে, আমরা মরে গেলেও একথা আর দ্বিতীয় লোককে বলছিনা।

—পরে জানতে পারলেও ত' মহা বিপদ তখন তোমরা কি উত্তর করবে ?

—পরের কথা পরে হবে মা। কোন চিন্তা করবেন না।

আমরা থাকতে—প্রাণ থাকতে বালকদ্বয়কে পিতা কেন যে কোন লোকের হাতে সপে দিবনা।

পুত্রের কথায় মাতা সন্তুষ্ট চিত্তে বল্লেন—বাবা তোমরা আমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর যে বালকদ্বয়কে রক্ষা করবে ?

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ বিষয়ে পিতা যাই বলুন না কেন আমরা তার কথা কখনই শুনবো না।

—দরকার পরলে পিতার কথার বিরোধীও হ'তে হবে কারণ তোমাব পিতা বুঝতে পারছেন না যে এটা ভয়ানক একটা পাপ কাজ। এ কল্পে নরকেও স্থান হবে না।

—তা আমরাও জানি। আপনি তা পারেন না।

—আচ্ছা বাবা নিশ্চিন্ত হ'লাম। বলে সকলে উঠে পরলেন।

ওদিকে মহম্মদ ও এব্রাহিন যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরে মহম্মদের নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—ভাই আর ঘুমিয়ো না। একটা স্বপ্ন দেখলাম। বড় আশ্চর্য্য।

—কি স্বপ্ন দেখলি। কাঁদছিস কেন। এত' ভয় কি ?

—শোন। স্বপ্ন দেখছি যেন হঠাৎ আকাশের দ্বার খুলে গেল। দেখলাম স্বর্গের বাগানে হজরত মহম্মদ রসুল মুক্‌বুল, হজরত আলী, হজরত বিবি ফাতেমা এবং হজরত হাসান উদ্যানে ভ্রমণ করছেন। পিতৃদেব তাদের পিছে পিছে বেড়াচ্ছে আমরা দুই ভ্রাতা দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এর মধ্যে হজরত

রসুল মুকবুল আমাদের পিতৃদেবকে সম্বোধন করে বল্লেন—মোসলেম তুমি চলে এলে আর তোমার দু'টো পুত্রকে জালেমের হাতে রেখে আসলে।

পিতৃদেব বললেন—তারাও হজরত এলাহির কৃপায় "ইন্‌সা আল্লাহ" আগামী কালই আমাদের সঙ্গে এসে একত্রিত হবে।

এব্রাহিম বল্ল—আমিও ঐ এক স্বপ্নই দেখেছি। রাত্রি প্রভাত হ'লেই ত' আমরা বাবার কাছে যাব। এস ভাই এই খানেই দুই ভাই গলা গলি ধরে শুয়ে পড়ি।

বলে তারা শুয়ে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল।

ওদিকে কান্নার শব্দে হারেস ঘুম থেকে জেগে উঠে চারি-দিকে চাইতে লাগল।

আমার বাড়িতে বালকের কান্না কিসের।

এ কান্না কোথা থেকে ভেসে আসল। কোথায় তাহারা কোথা হ'তে এসেছে? আমার কাছে এখনই নিয়ে এস আমি দেখবো তারা কে?

স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে। জাগরিত হ'য়েই দিপ জ্বাল দিপ জ্বাল করে সমানে চিৎকার ক'রেছেন। দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক এবার আর রক্ষা নাই।

স্বামীর কথায় হারেস গৃহিনী বল্‌লেন—কি হ'লো তুমি এমন করছ কেন?

হারেস—না বালকের কান্না শুনতে পেলাম। এ কান্না কোথা থেকে ভেসে এলো ?

তা জানি না।

ঐ ঐ শোন শিশুর ক্রন্দন রব। কে কাঁদছে রাত্রিকালে

—তা বলব কি করে ?

—ঠিক করে বল। নির্জ্জন রাত্রিকালে বালকের ক্রন্দন ধ্বনি। ব্যাপার কি ?

বলে হারেস আলো জ্বেলে সমস্ত বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

শেষটায় নির্জ্জন ঘরের দিকে এসে দেখলেন সত্যিই দুইটী বালক আপন মনে ক্রন্দন করছে।

বালকদ্বয়কে দেখে এক মহা বিস্ময় এসে তাকে আঘাত হানতে লাগলো।

—কে তোরা ? আর কাঁদছিস-ইবা কেন, শিগ্র বল ?

—আমরা হজরত মোসলেমের পুত্র।

—তোমরাই মোসলেমের পুত্র। আমি কি বোকা। হা কপাল আমি কত বড় একটা পাগল। শিকার ঘরের মধ্যে এসে বসে আছে আর আমি কিনা ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি। পাঁচ হাজার মোহর পায়ে হেঁটে আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে আছে। আর আমি গর্দ্দভ ঘুরে ঘুরে মরছি। আমার কপাল কত সুপ্রশস্ত।

রাত্রি প্রভাত হ'তে এখনও অনেক বাকি এতক্ষণ আমি চুপ করে থাকি কি করে। শিকার সমেত গিয়ে জেয়াদ দরবারে না পৌছা পর্যান্ত আর স্বস্তি নাই।

কোথায় যাবে! আর পালাবার স্থান কোথায়। বলিয়া দুই ভ্রাতার চুল ধরে টান দিলেন।

বালকদ্বয় অসহায় ভাবে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় পাষান গলে মথিত হ'য়ে যায়! কিন্তু নির্দ্দয় হারেস বালকদ্বয়ের গালে চড় মেরে বল্লেন—কাঁদবি ত, এখুনি মাথা কেটে নিব।

বলতে বলতে দুই ভ্রাতাকে শক্ত করে বেঁধে ফেল্লেন এবং তরবারি হাতে সম্মুখে বসে থাকলেন।

হারেসের মনে একটা বিরাট তোলপাড় সুরু হ'য়েছে তার ভাগ্য এতদিনে সত্য সত্যই সুপ্রশন্ন হ'য়েছে বটে।

হারেসের ব্যাপার দেখে গৃহিনী স্বামীর পা দু'খানি ধরে বল্লেন—ছেলে দুটীর প্রতি দয়া কর।

—হ্যাঁ দয়া ত' করবই। রাত্রি আছে, ভোর হ'লেই দয়া ভালভাবে দেখতে পাবে।

—দেখ তুমি স্বামী, তোমাকে সহস্র অনুরোধ করছি তুমি এদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

—দূর হ' হতভাগিনী। দূর হ।

—না আমি যাব না। তোমাকেও যেতে দেবো না।

—আমার কাছে এলে হত্যা করব। খবরদার এখানে এস না। এদের আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই।

—তোরা কি ভেবেছিলি ?

—আমরা যাই ভাবি মোসলেমের ছেলেদের তুমি রাজ দরবারে নিয়ে হাজির করতে পারবে না।

—নিয়ে যাব না তবে মুদ্রা আসবে কোথা থেকে। গহনা পাবি কোথা থেকে ?

—কিছুই আমার দরকার নাই তবুও এই বালকদের তুমি রক্ষা কর। এদের ছেরে দাম।

—পাগল—পাগল আর কি ?

—সে যাই বল আমরা তোমাকে এ অন্যায় করতে দিতে পারবো না। পরকালের দিক তোমার চাইতে হবে। টাকাটাই জগতের সব কিছু নয়। টাকা চিরস্থারি নয় এ কাজ করলে পাপে সব ছারখার হ'য়ে যাবে।

—তুই স্ত্রীলোক তুই কি বুঝবি ? ছেলেদের শুদ্ধ বশ করে ফেলেছিস। তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। তোরা আমায় কি বাধা দিবি ?

প্রভাত হইল।

হারেস উঠেই বালককে বেঁধেনিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফুরাত নদীর দিকে রওনা দিল।

হারেসের দুই পুত্রও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো। মাতাও তাদের পিছু পিছু।

তিন মাতাপুত্রে মিলে বালকদের জীবন রক্ষার্থে প্রাণ পণ চেষ্টা করবে।

তাদের দেহ থাকতে মোসলেমের পুত্রের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

তাদের মৃত্যু হ'লে তারপর যা হয় হবে। দেহে প্রাণ থাকতে শিশু অঙ্গ স্পর্শ করতে দিতে পারে না তারা।

হারেস এতদূর উত্তেজিত যে তার কিছুমাত্র সময় নেই অপেক্ষা করবার। এখনই শিরচ্ছেদ করে মাথা দুটো নিয়ে দরবারে না পৌছা পর্য্যন্ত তার আর স্বস্তি নাই।

পিতার ভাব দেখে স্ত্রী পুত্র এসে তার পায়ের উপর কেঁদে প'রলো:—দোহাই তোমার অবোধ শিশু এদের কোন দোষ নেই। এদের জীবন তুমি নাশ করো না। আমাদের কথা রাখ তুমি।

হারেস সে সব কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে ফুরাত নদীর দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

কত অনুরোধ কিছুতেই হারেসের মন টল্‌ল না। হাজার হাজার অনুরোধ কিছুতেই কিছু নয়। শেষটাশ বালকদ্বয় বড়ো করুণ ভাবে কেঁদে বল্‌ল—আমাদের ছেরে দিন একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসবো। আর কিছু আমাদের বলবার নাই। একবার ছেড়ে দিন।

—পুত্র ধরতো আজ দেখি এক কোবে দু'টাকে শেষ করতে পারি কিনা।

—আমি আর পারবো না। আমায় মার্জ্জনা করবেন। নিরপরাধ, দুইটী 'পিতৃহীন অনাথ বালককে টাকার জন্য হত্যা করবেন না। ক্ষমা করুণ আমি আপনার কথা রাখতে পারবো না।

পুত্রের কথায় রোষভরে হারেস বল্‌ল—ওরে পামর, আমার কাজ নিয়ে তুই মাথা ঘামাচ্ছিস। তুই আমার কথা শুনবিনে ?

—আপনি একটা ডাকাত, হত্যাকারী।

—আমি ডাকাত ? ওরে নরাধম তোর এত বড় স্পর্দ্ধা।

—আপনি যা খুসি তাই বলতে পারেন আমি মানুষ খুন করতে পাবো না।

—কেন পারবি না ?

—আমাদের আদেশ অমান্য করবি ? পিতার কথা অমান্য করবি নরাধম ?

আপনি মহা পাপি পিতা। আপনার আদেশ শোনাও মহাপাপ। আপনি যে আমার পিতা তা ভাবতেও ঘৃণা হয়' আপনি মানুষ নয়। দস্যু, তস্কর,। বলতে বলতে বালকদের দিকে চেয়ে বল্‌ল—চল ভাই তোমাদের মদিনায় দিয়ে আসি আমার সঙ্গে এস—

পুত্রের কথায় পিতা বল্‌লেন—ওরে নিমোখরাম আমার হাত থেকে তুই বালককে ছিনিয়ে নিয়ে যাবি তোর এত বড়

কথা। এত বড় সাহস। তোকেই আগে শিক্ষা দিবো তারপর অন্যকে।

বলে তরবারি উঠিয়ে পালক পুত্রকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন।

মাথা বালুর উপর পড়ে গড়াগড়ি করতে লাগলো।

রক্ত···তাজা রক্তের ফোয়ারা বয়ে গেল ফুরাত কুলে।

হারেসের স্ত্রী পালক পুত্রের অবস্থা দেখে বিহ্বলাহত হ'য়ে স্তব্ধ হয়ে রইল প্রথম দিকটায়। তিনি রোষে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে নিজ গর্ভ জাত পুত্রকে বলল—এইত সময় তোমার প্রতিজ্ঞা পুরন কর। বালক দু'টাকে রক্ষা কর।

মায়ের আদেশে রাক্ষস নর ঘাতকের হাত থেকে বল পূর্বক কেড়ে নিয়ে সরে এলো।

হারেস গর্জ্জে উঠল মরনের মত নিষ্ঠুর ভাবে।

—কিরে পাসর তুই এসেছিস আবার এদের হ'য়ে তবে তুইও যা জাহান্নবে। আমার টাকা পাওয়া দেখে তোদের সকলেরই তবে হিংসা হ'য়েছে? ওরে মূর্খ ছেড়েদে নইলে তোর শীরও ভূতলে লুটিয়ে পরবে।

—না না তা কখনও হ'তে পারবে না। পিশাচ সরে যা আমাদের কাছ থেকে।

—এখনও বালকদের ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাও নইলে তোমারও কাল ঘনিয়ে এসেছে। নিজ পুত্র বলে মার্জ্জনা করবো না।

—তোমার মার্জ্জনাকে ঘৃণা করি। ঘাতক মহাপাপী অর্থ পিশাচ সরে যা···সরে যা নরাধম।

—দে দে ছেড়ে দে বলছি। আমার হাতে ওদের ছেড়ে দে। এতে তোদেরও লাভ হবে। আমার একার কিছু নয়। তোদেরও দেবো।

—না তা হবে না। জীবন্ত জীবকে নরখাদকের হাতে দিলে মহাপাপ। সরে যা সম্মুখ থেকে তোর মুখ দেখলেও মহাপাপ।

—কিরে দিবিনা তবে যা শেষ হ'য়ে এ জীবনের মত বলতে বলতে নিজ পুত্রের ঘাড়ে তরোয়াল দিয়ে এক ঘা কসল।

—আবার রক্ত নদী···

রক্তের ছড়া ছড়ি।

রক্ত নদীর প্রস্রবন।

উঃ! মায়ের চোখের উপর তারই পুত্রের এই দশা অসহ্য অসহ্য···

মায়ের বুকখানা মড় মড় করে যেন ভেঙ্গে চুরে খান খান হ'য়ে যাচ্ছে।

খোদা···পরম পিতা এর শাস্তি কি। এ অপরাধ তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না।

হারেস গৃহিনীর চোখে জল নাই পুত্রদ্বয়ের মুণ্ড ফুরাতের জলকে যেন রাঙ্গিয়ে দিয়েছে।

চক্ষু দুইটীতে এখনও সেই সাম্য সুন্দর স্থির চাহনি। কতযুগ থেকে ওচোখ যেন এমনি করে চেয়ে রয়েছে।

চির চাহনির শেষ আছে কি কোন কালে…

এরপর তৃতীয় অঙ্ক সুরু হ'ল। সে তরবারি ওঠাল বালকদ্বয়ের উপর এবার তোরা জাহান্নবে যা। তোদের ভাগ্য সব শেষ। বলে যেই তরবারি উঠিয়েছেন ওমনি গৃহিনী এসে সম্মুখে দাঁড়াল—ছি ছি ওকি কর ওকি কর। এদের ছেড়ে দাও—এদের তুমি কিছুতেই মারতে পারবে না।

—সরে যা শয়তানী আমার সম্মুখ থেকে। এবার তোর

—শেষ করবো তাই কর তবুও আমি বেঁচে থাকতে এদের মস্তক তুমি খণ্ডি ত করতে পারবে না।

—নিশ্চয়ই করতে পারবো। সমস্ত শেষ হ'যে যাক তবুও এদের মাথা চাই। টাকার দরকার। মাথা চাই আমার।

—তোমার কি অবস্থা তাকি দেখতে পাচ্ছ না। সম্মুখে পুত্রদ্বয়ের ছিন্ন মস্তক। পাষাণ তবুও কি মনে একটু বোধ আসছে না ?

—সব দেখছি কিন্তু সহস্র মুদ্রা দেখতে পাচ্ছি না। আমার আর কিন্তু দরকার নাই আমার দরকার শুধু টাকা।

—বঃ! জগৎ দেখুক তোমার অমরকির্ত্তী পুত্র হত্যা পর্য্যন্ত করেছ টাকার জন্য। অর্থের দরকারে প্লিতৃ স্নেহ পর্য্যন্ত রসাতলে তলিয়ে গেল বাঃ রে আদর্শ পিতা…বাহ বারে তোমার বীরত্ব ··যে অমরকির্ত্তী জগতের ইতিহাসে চিহ্নিত করে রাখলে

তা চিরকাল তোমার নিকৃষ্ট চরিত্রের উদাহরণ হ'নে ধরার মাটিকে কলঙ্কিত করে রাখবে।

—তুমি সরে যাও উপদেশ আমি শুনও চাই না। সরে যাও বলছি।

—না—না—না কিছুতেই আমি সরতে পারবো না আগে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর তারপর মোসলেমের পুত্রদের গায়ে হাত দিও।

—সব এখনও ছারলে না? তবে রে নাড়কী উচ্ছন্নে যা। বলে এক আঘাৎ।

তরবারি আর একবার রেঙ্গে উঠলো।

মুহূর্ত্তে স্ত্রীর মস্তক ভূতলে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন তাজা রক্তের উষ্ণ প্রশ্রবণ। রক্তের নদী ধারা বয়ে যেতে লাগলো ফুরাত কূলে।

এবার নরঘাতক পিশাচ হারেস তরোয়াল হাতে এগিয়ে এলো মোসলেমে পুত্রদের নিকট—ওরে শয়তানের বাচ্ছা এবার তোদের কে রক্ষা করে দেখ?

—মারবেন না। মারবেন না···

—চুপরাও এখুনি তোদেরে জাহান্নমে পাঠার।

—হারেসের কথায় মোসলেমের জেষ্ঠ পুত্র বল্ল—দেখ ভাই তুমি আমাদের হত্যা কর তাতে আর আমার আপত্তি নাই। চোখের উপরই সব দেখলাম। তবে একটা মাত্র

অনুরোধ আগে আমাকে হত্যা কর। পরে আমার ছোট ভাইকে। আমি অনুজের হত্যা স্বচক্ষে দেখতে পারবো না।

তরোয়াল উঠাতেই ছোট ভাই বল্ল হারেস সংযত কর অসি। আমার মাথা আগে নাও ভাই তারপর আমার জেষ্ঠের। এইটুকু কৃপা তুমি কর ভাই আর কিছু নয়। আমি আমার শেষ অনুরোধ করছি। এইটুকু কৃপা করুণ।

—না না তোদের কারো কথাই শুনবো না প্রস্তুত হ'। মরণের জন্য এগিয়ে আয়। ঘার পেতে দে। তোদের দু' জনের শেষ ইচ্ছাই পূরণ করি।

মুহূর্ত্তে দু'টী ভাই এর শির খণ্ডিত অবস্থায় ফুরাতের কূলে গড়াগড়ি করতে লাগলো।

রক্ত ধারায় ফুরাত নদীতে এক নূতন রক্ত জোয়ারের বান ডেকে উঠলো।

রক্ত আর দেহ অঙ্গ খণ্ডিত অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে।

হারেস ক্ষীপ্র গতিতে. মৃতদেহ গুলো ফুরাতের জলে নিক্ষেপ করে মোসলেম পুত্রদ্বয়ের মস্তক হাতে রাজ দরবারে গিয়ে বল্ল—বাদশা নাসদার আপনার আদেশ মত এই নিন দুই শিশু মুণ্ড। আপনার যা আজ্ঞা ছিল আমি তার কিঞ্চিৎ বেশী করেছি। অপরে কেড়ে নেবে ভেবে মাথা কেটে নিয়ে এসেছি।

এবারে আপনার আদেশ মত আমাকে অর্থ দিয়ে দিন।

হারেসের চেহারা ও ভাব দেখে সভাস্থ সকলে নিমেষে চকিত হ'য়ে উঠলো। একি রূপ···একি জঘন্য প্রবৃত্তি।

হারেসের কথায় আবদুল্লা জেয়াদ বল্লেন তুমি কার কথায় এমন সুন্দর বালকদ্বয়ের শিরচ্ছেদ করে এনেছ। যাও বেরিয়ে যাও—নর পিশাচ এখান থেকে এই মুণ্ড দু'টীর রক্ত ধুয়ে মুছে একটা রেকাবিতে করে এনে আমার কাছে নিয়ে এস।

তখনি নরপতির ইচ্ছা মত ধুয়ে মুছে মাথা দু'টীকে নিয়ে হারেস উপস্থিত হ'লো।

ওরে বালক হত্যাকারি পাষাণ তুই কি পশু! না কি মানুষ।

তুই কি করে এমন কোমল অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত করলি? মহারাজ এজিদ নামদার যদি বালকদ্বয়কে দামেস্ক পাঠাতে বলেন তখন আমি কি করবো। ওহে অতিশয় বীরপুরুষ আমার ঘোষণায় কি শিরচ্ছেদ করবার কথা ছিল।

—আজ্ঞে না তা কথা ছিল না। ধরিয়া আনবার কথা ছিল। জীবিত অবস্থায় আনা সম্ভব নয় বলে মাথা নিয়ে এসেছি। আমার দুই দিন দুই রাত ঘুম বা বিশ্রাম নাই। এই শিশুদ্বয়ের জন্য আমার দুই পুত্রকে হত্যা করেছি স্ত্রীকে হত্যা করেছি তারপর এদের হত্যা করা সম্ভব হ'য়েছে। দয়া করে আমাকে বিদেয় করে দিন।

—সে কি কথা! এতগুলো প্রাণী তুমি স্ব ইচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা করেছ?

—আপনার শত্রুকুল নিপাত করেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বংশও লোপ করেছি। কিন্তু আমার মোহর কই?

—আপনার পুরস্কাব ধরা আছে।

—আমার দুই পুত্র ও স্ত্রী কিছুতেই বালকদ্বয়কে কাটতে দিতে চায় না একে একে বাধা দিল এবং একে একে প্রাণ সংহার করলাম।

হারেসের কথায় আবদুল্লা জেয়াদ আদেশ দিলেন—দেখ টাকার লোভে যে লোক ৫টী প্রাণীকে হত্যা করতে পারে। সে না পারে এমন কিছু নেই জগতে তার শির দেহে থাকা সঙ্গত নয় একেও একুণি ফোরত কুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর। কিন্তু ফুরাতের জলে এই পাপত্মাকে ফেলো না। এই নরপিশাচ সে পূণ্য জলে নিক্ষেপের উপযুক্ত নয়। এর দেহ যাতে শিয়াল কুকুরের আহার্য্য হয় তার ব্যবস্থা করে দিও এই এর উপযুক্ত পুরস্কার।

আর বালকদ্বয়ের মাথা স্বসর্ম্মানে নিয়ে যাও যদি দেহ অংশ পাওয়া যায় তবে কাফন দিয়ে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে কবর দেবে। যাও এই পশুর উপযুক্ত পুরস্কার হ'ল এই।

—এ কি জাহাপনা একি আদেশ করলেন?

—এই তোর পাপের শাস্তি। এতেও তোব পাপ কম হবে না আরও বহু কিছু তোকে সহ্য করতে হ'বে অর্থ লোভি।

ঘাতক, প্রহরী ও অন্যান্য সকলে তখন রাজ আদেশ মত কার্য্য করতে প্রবৃত্ত হ'লো।

ফুরাত কূলে যেয়ে দেখলো যে এক স্থানে রক্ত আর বায়ু জমাট বেঁধে রয়েছে।

আর বালকদ্বয়ের দেহ জরা জরি করে জলে ভাসছে। একটি একটি করে যে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়া হ'য়েছিল এদের এক সাঙ্গ করল কে। আর স্রোতের টানের ভেতরও এরা একই স্থানে ভেসে আছে কি ক'রে।

অলক্ষ্য থেকে কে এই দেহ সংলগ্ন করছে তাই ভেবে রাজ কর্ম্মচারী অবাক বনে রইল।

সত্যি-ই অদ্ভুত বটে।...

প্রভুর আদেশে রাজকর্ম্মচারী হারেস কে বধ্য ভূমিতে নিয়ে এসে দাঁড় করাল।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হারেস কেঁদে উঠল—আমাকে রক্ষা করুন। আমি রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করেছি আমার শেষটার এই দশা?

—তুমি কত জনের এত দশা ক'য়েছ মনে পড়ে না পামর

—কিন্তু রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করেছি আমার এ শাস্তি হওয়া অন্যায় চুরান্ত অন্যায়।

—শিশু হত্যা, নারী হত্যা, পুত্র হত্যা আরো বেশী অন্যায় জহ্লাদ সে সময় কি মনে ছিল না?

—আমাকে ক্ষমা করুন।

—শেষ ক্ষমা করবো। যাতে আর এমন কাজ জীবনে না করতে হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

—রাজা মিথ্যাবাদী তারও শীর দ্বিখণ্ডিত করা উচিৎ। কুলাঙ্গার রাজা বলে হারেস রাগে গড় গড করতে লাগলো।

তার আর কোন ভয় ভীত নাই। শেষ যখন হ'তেই হবে তখন আর ভয় কি!

হারেস রাগ করছিলেন এমন সময় রাজ ঘাতক তার ঘাডের এক কোবে হারেমের পাপ মস্তক ধূলো বিলুন্ঠিত করে দিল।

ধরার বুক থেকে মহাপাপের আর একটি পায়শ্চিত্ত হ'ল।

কারবালা প্রান্তরে

হোসেন সপরিবারে ছয় হাজার সৈন্য সহকারে নির্বিঘ্নে কুফার দিকে এগিয়ে চলছিলেন।

চলতে চলতে হঠাৎ একদিন হোসেনের ঘোড়ার পায়ের খুর মাটিতে পুতে গেল।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রভু মোহম্মদের ভবিষ্যত বাণী তার মনে পল্ল।

নির্ভিক শরীরে ভয়ের সঞ্চার হ'ল। হোসেন গণনা করে দেখলেন আজ মহরম মাসের অষ্টম তারিখ অশ্বকে স্বজোরে চালনা করলেন।

অশ্ব গতিবেগে ছুটল। সম্মুখে বিজন অরণ্য বিস্তৃর্ণ প্রান্তর।

চতুর্দ্দিকে কোন জন মানবের কোন নাম গন্ধ নাই। ধু ধু করছে মাঠ আর বালু···মাঠ আর বালু।

অকারণে প্রকৃতি যেন হায় হায় শব্দ করছেন। যে দিকেই কান পাতা যায় কেবলই একই শব্দ!

লোক নাই, জন নাই তবুও ঐ করুণ হায় হায় শব্দ আসে কোথা থেকে?

মনে হয় যেন শূন্য পথে শত সহস্র মুখে কারা হায় হায় শব্দ করে যাচ্ছে সমানে। ব্যাকুল আর্ত্তনাদ। করুণ ভাবে দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত করে তুলেছে।

হোসেন চিন্তিতভাবে সকরুন স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বল্ল—ভাই সকল, হাস্য তামাসা দূর কর। পিতার নাম মনে কর। আমরা ভয়ানক স্থানে এসে পড়েছি। এ স্থানের নাম করতে আমার হৃদয় কেঁপে উঠেছে। প্রান ফেটে যাচ্ছে।

ভাইগণ মাতামহ বলেছিলেন যে, যে স্থানে গিয়ে তোমার অশ্বের খুর মাটিতে দেবে যাবে। নিশ্চয় করে জেনো সেই তোমার মৃত্যু স্থান দাস্ত কারবালা।

মাতামহের কথা মিথ্যা হতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে সেই দাস্ত করেবালায় এসে পড়েছি। তোমরা দৈব বাণী শুনছো নিয়ত হায় হায় রব।

সকলেই এক বাক্যে শুনলেন—হ্যা শুনতে পাচ্ছি। ঐ কানে ভেসে আসে হায় হায় রব। ধন্য নূরনুবী মহম্মদ।

—মাতামহ আরোও বলেছিলেন যে, যে স্থানে চারিদিক থেকে হায় হায় রব উঠবে সেই স্থানই কারবালা।

ঈশ্বরের লীলা কার বুঝবার শক্তি আছে? তাই সব ঈশ্বরের নাম নিয়ে গমনে খান্ত দাও।

ঐ রব যে সেখান হ'তে শুনছ থেমে পড়। আর যেন গায়ে জোর নাই। চলবার শক্তি সামর্থ ক্রমেই যেন নিস্তেজ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

হোসেন ব'ললেন—ভাইগণ, আমার কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আমার ভাবনার নাই কিছু। এইখানেই শিবির স্থাপন করে ঈশ্বরের নাম জপ করা যাক। তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করা ভাল।

সম্মুখে প্রান্তর পাশে বিজন অরণ্য। কোথায় যাওয়া যায়। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করা যাক। অন্য চিন্তা করার কোন ফল নাই।

আমি জানি ফোরাত নদী এই স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত থাকবে।

কতদূরে নদী খোজ করে জল নিয়ে এস। পিপাসায় অনেকেই বড় কাতর হ'য়ে প'ড়েছে। আহারাদি সংগ্রহ কর সমস্ত ব্যবস্থা কর খাওয়া দাওয়ার।

শিবির নির্মাণ কর সুমুখের বনে রান্নার কাঠ ও শিবির পোঁতার কাঠ যারা যোগার করতে গিয়েছিল তারা ত' বনে গিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

সন্দিভাক কুরোল হাতে ফিরে এসে তারা বল্ল—প্রভু এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমরা আর কখনই দেখি নাই। কোন দিন কারো মুখে শুনি নাই।

যে বৃক্ষের গায়ে আঘাৎ করলাম সেই গাছের গায়েই অজস্র রক্ত ধারা বইছে। ভয় পেয়ে আমরা ফিরে এলাম। সাহস হলো না। এই দেখুন সকলের কুরোলেই কি সাংঘাতিক রক্তের দাগ।

হোসেন দেখলেন সমস্ত কুড়োলেই রক্তের দাগ। তখন তিনি স্থির নিশ্চিত হ'লেন যে এই হ'লো দীপ্ত কারবালা। তোমরা সকলে এখানে সহিদ হ'য়ে স্বর্গ সুখভোগ করবে। তারই নমুনা ভগবান রক্ত দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যাও তোমরা কাঠ আরোহন করে এসে। দারু রস রক্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে এসেছে। ভয় পাবার কিছু নাই।

এমামের কথায় সকলে সানন্দে যার যার কাজ নিয়ে সকলে ব্যস্ত হ'লো।

এমামের পরিজন বর্গের জন্য অনতিদূরে নির্জ্জন স্থান বাছিয়া শিবির স্থাপন করা হ'লো।

আরব দেশে দাস প্রথা র'য়েছে। যে সকল ক্রীত দাস হোসেনের সঙ্গে রয়েছে তারা ক'য়েকজন একত্রে ফুরাত নদীর অন্বেষণে বেরিয়ে পরলো।

কিন্তু অনতিদূর হ'তে ফিরে এসে বল্ল—বাদশা মামদার আমরা ফোরাত নদীর অন্বেষণে বেরিয়ে দেখলাম যে ফোরাত

নদী দক্ষিণ বাহিনী হ'য়ে প্রবাহিত হ'চ্ছে। জল দেখে বড়ই পান করবার ইচ্ছা হ'ল কিন্তু নদী তীরে অসংখ্য সৈন্য থাকায় তারা জল দিল না। তারা খুব সাবধানে নদীর জল পাহারা দিচ্ছে।

যতদূরে চোখ যায় কেবল সৈন্য সৈন্য আর সৈন্য। কোন এক স্থানও খালি নাই।

—সৈন্যরা কি বল্ল?

—বল্ল মহারাজ এজিদের হুকুমে এই জল পাহাড়া দেওয়া হ'চ্ছে। আমাদের দেহে বিন্দু মাত্র রক্ত থাকতেও কেউ এক ফোটা জল নিতে পারবে না।

কথা শুনে হোসেন খুব চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। খাদ্যের হয়ত অভাব প'রবে না কিন্তু জল না পেলে চলবে কি করে?

মদিনার বহু সংখ্যক লোক সঙ্গে র'য়েছে। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ যখন পিপাসায় কাতর হয়ে উঠবে জিহ্বা কণ্ঠ শুকিয়ে আসবে তখন কি উপায় হবে।

ভাবতে হোসেন শিহোরিয়ে উঠছিলেন। এই সময় তিনি ফোরাতের দিকে চেয়ে আছেন এমন সময় দেখলেন চারজন সৈনিক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মনে ভাবলেন যে মোসলেম হয়ত সৈন্য দূরে রেখে আগে আমাদের খবর নিতে আসছে।

'কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সৈনিকগণ এসে হোসেনের পদ চুম্বণ করে বল্লে—বাদশা নামদার। একটি দুঃখের কথা আপনাকে জানাতে আসছি।

আমরা আপনার মাতামহের শিষ্য। আমরা এজিদের ফোরাত নদী পাহারা দিচ্ছি। আমরা কিছুরই প্রত্যাশী নই।

শত্রুর বেতনভোগি বলে দয়াপরবশ হ'য়ে শত্রু মনে করবেন না।

আপনার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে খবর দিতে এসেছি। আপনার এখন খুব খারাপ সময়। খুব সাবধানে চলিবেন।

কুফায় মোসলেমকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে সে প্রথম কিছু বুঝতে পারে নাই। পরে টের পায় যে আবদুল্লা জোয়াদ এজিদের পরামর্শ মতই এমনি সব মিথ্যা ষড়যন্ত্র ক'রেছে।

এবং কায়দা করে মোসলেমকে বন্দী করেছে। শেষটায় অলীদ এসে সৈন্য নিয়ে মোসলেমকে আক্রমণ করে।

কিন্তু মোসলেমের বীরত্বে যখন ওলীদ একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে সেই সময় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে স্বয়ং অবদুল্লা নিজে মোসলেমকে আক্রমণ করলেন।

মোসলেম আর কি করে।

অসংখ্য আঘাতে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয়। তারপর শিশুপুত্র দুটীকে শিরচ্ছেদ করা হয় আপনি যাকে এত বিশ্বাস করে যার কাছে যাচ্ছিলেন সে আপনার কত বড় শত্রু এবার বুঝুন। মারোয়ান ও ওলীদ আমাদের ফোরাত

কুলে এখনও এসে পৌছায় নি আমরাই নদী পাহাড়া দিচ্ছি যাহা হয় খুব চিন্তা করে চলবেন। এটা কিন্তু ভয়ানক স্থান।

এর নাম দান্ত কারবালা।

বার্ত্তা দিয়ে সৈনিকগণ আবার ফিরে গেল।

হোসেন বড়ই মর্ম্মাহত হ'লেন।

হায় হায় হায় তার প্রাণরক্ষার নিমিত্তই মোসলেমের প্রাণ গেল। আবদুল্লা জেয়াদ এত বড় পাপী তা তিনি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেন নি।

এত লোক তার কারণে শেষ পথ যাত্রা সুরু করেছে।

এর শেষ কোথায় তা হোসেন নিজেও ঠিক বলতে পারে না।

ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হ'য়ে অবধি বুঝতে পারলেন জগতে কত পাপী মহাপাপী বাস করছে।

এদের গতি কি। ভগবান এদের অন্যায়ের জন্য এদের তুমি মার্জ্জনা ক'রো। এরা যে অন্যায় করছে, তা তারা মোটেই জানে না।

এদের যে কি গতি হবে তাই ভেবে হজরত হোসেন দয়ার্দ্র চিত্তে ভগবানের নিকট উপাসনা করলেন নিজের জীবনের সন্ধিক্ষণে তাঁর সর্বদার জন্যই কেবল ঈশ্বর চিন্তা।

সময় অতিবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে।

ক্রমেই সকলে পিপাসায় অতিষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো।

সকলেই বলতে লাগলো পিপাসায় আর ত পারা যায় না প্রভু একটু জলের ব্যবস্থা করুন।

হোসেন বল্লেন—কি করি। বিন্দুমাত্র জলও পাবার আশা নাই।

ঈশ্বরের নাম ভিন্ন সুধামৃত আর পাবার উপায় নাই।

বিনা জলে যদি প্রাণ যায়। তবে সকলেই সেই করুণাময় পরম পিতার ধ্যান উপাসনা সুরু কর। শেষ মুহূর্ত্তে এভিন্ন আর উপায় নাই।

সকলেই একমনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করতে লাগলেন। এমনি করেই ৯ই তারিখ কেটে গেল।

দশম দিবস।

প্রাতে হোসেন শিবিরে মহা কোলাহল।

প্রাণ যায়। আর সহ্য হয় না। উঃ।

অসংখ্য বালকবালিকা পিপাসায় ছটফট্ করছে। পরিজনের আর্ত্তনাদে সমস্ত কারবালা মুখরিত হ'য়ে উঠেছে।

জল ··জল···জল···

পিপাসায় বুক ফেটে যায়···প্রাণ গেল রক্ষা কর···

উপাসনায় ক্ষান্ত দিয়ে তিনি হাসনেবানু ও জয়নাবের নকট গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, ছোট ছোট কচি মুখ এসে পিপাসায় কাতরভাবে ঘিরে দাঁড়াল।

উঃ। কি মর্ম্মান্তিক। কি করুণ!! কি অসহায়!!!

সহরেবানু পুত্র কোলে এসে বল্লেন—আজ নয় দিনের ভিতর

জল খাই নাই। পিপাসায় আর ত' পারি না। কি করি। তার উপর স্তনের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। এই দুগ্ধপোষ্য জলের অভাবে মৃত্যুপথে এগিয়ে যাচ্ছে এই সময় একবিন্দু জল পেলেও বোধহয় এ বাঁচতো।

—জল কোথায় পাব?

—কেন ফোরাত নদীতে।

—এজিদের সৈন্যরা ফোরাত নদী অবরোধ করে বসে আছে।

—আপনি নিজে গিয়েও যদি একটু জল আনতে পারেন তবে তাই যান। শিশুর প্রাণের জন্যই আমি আপনাকে যেতে এত তাড়া দিচ্ছি। আমাদের কপালে ভগবান যা লিখেছেন তাই হবে। সে কথা চিন্তা করবেন না।

—জীবনে কোনদিনই শত্রুর নিকটে প্রার্থী হই নি যদি জল চাই তবে তা তারা নিশ্চয়ই দেবে না। কষ্ট দেয়ার জন্যই ত' তারা অবরোধ করে আছে।

আমাদের প্রাণ নাশ করাই ত' তাদের উদ্দেশ্য।

সহরেবানু আবার বল্ল—তা যাই হ'ক পুত্রের জন্য আপনাকে যেতেই হবে। চোখের সামনে পিপাসায় মৃত্যু হবে তা আর দেখতে পারবো না।

—আচ্ছা দাও, আমার কোলে দাও। সাধ্য মত চেষ্টা করে দেখি। বলে হোসেন ঘোড়ার উপর উঠিলেন।

এবং মুহূর্ত মধ্যে ফোরাত কূলে উপস্থিত হ'য়ে বললেন

—ভাই সব ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থাক। তবে এই দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখের দিকে চেয়ে একটু জল দাও। পিপাসায় এর কণ্ঠ তালু শুকিয়ে উঠেছে।

এই দুগ্ধ পোষ্যর জন্য একটু জল দাও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।

কেহই কোন কথা বলবেন না।

হোসেন আবার বল্লেন—ভাই সকল ! মানুষের সব দিন সমান যায় না। দিনের আলো নিভে গেলে অনিবার্য্য অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার কথা একবার ভেবে দেখো তাঁহাকে একটু ভয় কর বন্ধুগণ !

পিপাসায় জল দান করা মহাপুণ্যের কাজ। ভাই গণ এর জীবন তোমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আমার পিতা মহামান্য হজরত আলী, মাতামহ নূরন্নবী হজরত মহাম্মদ, মাতা ফাতেমা জোহরা খাতুনে জেন্নাত এই সকল মহা পুণ্যাত্মাদের নাম করেও একে একটু জল দাও ভাই। একটু জল দাও।

তোমাদের নিকট কোনো অপরাধ করি নাই একে জল দিয়ে একটা শিশুর প্রাণ দান কর।

একজন বল্লেন—তোমার পরিচয় জানলাম তুমি হোসেন। সুতরাং তুমি একবিন্দু জল পেতে পার না। তোমার পুত্র

জল পিপাসায় মরে গেলে তোমার দুঃখ কি। তুমি ত' এখনই মরবে।

সন্তানের জন্য না কেঁদে একবার তোমার জন্য কেঁদে নাও।

তোমার জীবন নাশের শেষ স্থান কারবালায় এসে পরেছো আর তোমার ভয় কি।

মরার জন্য প্রস্তুত হও। বলে সৈনিক এক ধারালো বর্ষা হোসেন কে উদ্দেশ্য করে আঘাত করলো।

কিন্তু সে বর্ষা হোসেনের বুকে না লেগে কোলের শিশুর গায়ে লাগা মাত্র শিশুটার বুক বিদির্ণ হ'য়ে গেল অঝোড়ে রক্ত ধারা।

সারা দেহ অঙ্গ রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো। লাল টক্ টকে্ হ'য়ে।

অসহ্য মানসিক উত্তেজনায় হোসেন বল্ল—ওরে পশু। তুই এ কি করলি ?

এই শিশুর প্রাণ নিয়ে তোর কি লাভ হ'লো। এখন কোন মুখে আমি এর মার কাছে একে নিয়ে যাব।

সহরে বানুর নিকটে গিয়ে কি বলব আমি। পরে শিবিরে ফিরে এসে সহরে বানুকে বল্লেন—ধর তোমার পুত্রকে নাও। বাছার জল পিপাসা চিরতরে নিবারণ করে এনেছি।

সকলেই কাঁদা কাটি আরম্ভ করে দিলেন। এমন সময় এক বীর জননী তার পুত্রকে ডেকে বল্লেন—আবদুল ওহাব। তুমি এত বড় যোদ্ধা থাকতে এই বিপদ হ'চ্ছে। এর সমুচিৎ

বিধান কর। এখনই যুদ্ধে যাও প্রভুর বিপদ এখনও তোমরা অপেক্ষা করে বসে আছ—যাও এখনই যুদ্ধে যাও।

—যে আজ্ঞে। এখনই যাচ্ছি।

মাতা আবার বল্লেন ধিক, তোমাদের। জল বিনে সমস্ত লোক অতিষ্ট হয়ে উঠেছে আর তোমরা চুপ চাপ বসে রয়েছে। জগতের নারী জাতি জগতে কান্নার জন্যই জন্ম নিয়েছে কিন্তু পুরুষ সে জন্য নয়।

—আচ্ছা মাতা আমি চল্লাম। আগে জলের যোগার করবো এবং হোসেনের পরিবারবর্গসহ সকলে জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবার পর আমার তৃপ্তি।

হয় জল না হয় মৃত্যু এর দুইয়ের এক বেছে নিলাম। যদি আমি মানুষের পিপাসা না মেটাতে পারি তা'লে ঐ ফুরাতের জলে প্রথম রক্ত ধারায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠবে। তবে একবার স্ত্রীর সঙ্গে শেষ দেখা করে যেতে চাই।

—ছি ছিঃ বড় ঘৃণার কথা। যুদ্ধ যাত্রীর সঙ্গে আর রমনীর সম্পর্ক কি। যাতে এই সময় মায়ার উদ্রেক না হয় তাই ভাল।

কারণ নিশংস ব্যাপারে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ। ঈশ্বরের দয়ায় আগে ফোরাতকুল উদ্ধার করে জল নিয়ে এসে হোসেন পরিবারের জীবন বাঁচাও। মদিনা বসৌদের প্রাণ বাঁচাও তারপর তোমার বিশ্রাম।

বীরের আবার মায়া মমতা কি? একদিন জন্ম হ'য়েছে আর একদিন মৃত্যু হবে এ আর নূতন কথা কি।

আর মনে করে থাক এই তোমার শেষ যাত্রা আর ফিরবে না তাহ'লেও আমি সুখী নই।

বীর ঘর থেকে বের হবার সময় সর্বদা মনে করবে আবার দেশে ফিরে আসব। আবার সব কিছু হবে। নইলে

মনের জোর অনেকখানি কমে যায়।

আর যদি শেষ যাত্রা বলে মনে করে থাক তাহলে তোমাকে আমি কাপুরুষ বলবো। বীর বংশের অযোগ্য। বীরকুলের কুলাঙ্গার।

কথা শেষ করে আবদুল ওয়াব আর একটি কথাও না বলে মাতার চরণ চুম্বন করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওনা হ'লো

এরপর অদূরে নদীর সন্নিকটে গিয়ে বল্ল—ওরে মহাপাপীর দল যদি বাঁচতে চাস তবে এখনই নদীকূল ছেরে চলে যা।

তোরা জীবনটাকে কি চির সত্য বলে মনে করেছিস। শেষ বিচারের দিন ত' একদিন আসবেই। সে দিনের কথা ভেবেছিস নরাধমরা।

অর্থের জন্ম কি মানুষ ধর্ম্ম মনুষত্ব সব কিছু ভুলে যায়।

এখনও বলছি ফুরাত কুল ছেড়ে চলে যা। নইলে তোদের জীবনে আজই শেষ দিন বলে জানিস।

দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে চোরের মত দূর থেকে সর নিক্ষেপ-কি কোন বীরের ধর্ম্ম।

যদি বীরত্বের গর্ব কারো থাকে তবে আমার সাথে আয় এ জীবনের শেষ দিন করেছি।

যদি মরবার ভয় থাকে ফোরাত ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নাও।

বললে আবদুল ওহাব অশ্বে কষাঘাত করে শত্রুদের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আর বলতে লাগলো—আয় নরাধমরা দেরী করেছিস কেন। তোদের যুদ্ধের মখ মিটিয়ে দি। একেবারে নরকের ঘোর গোরায় তোদের দিয়ে যাই।

—আরে মুর্খ! মুর্খরাই দর্প করে। আয় তোর যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দি।

—আয়রে কাফের তোর যুদ্ধ বাসনা আজই অবসান হ'ক বলে আবদুল ওয়াব ঘোড়া ছুটিয়ে বিপক্ষ সৈনিকে উপর ঝাপিয়ে পড়্ল।

এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে শানিত তরবারির এক কোবে ঘোড়া সমেত কাফেরকে ধরা শায়ি করে দিল।

এমনি এক নিমেষে সত্তর জন কাফেরকে ধরা শায়ি করে আবার এগিয়ে চল্ল।

চারদিক থেকে যতই আঘাত আসতে লাগলো তখন কাফের ধ্বংশ করতে এগিয়ে চল্ল। ওহাব দু' হাতে অসি চালনা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ভাগ্য বিরম্বনায় ওহাব সবিশেষ কাতর হ'য়ে পল্ল।

উপায় বিহীন হ'য়ে ওহাব ফিরে এলো হোসেনের কাছে—প্রভু একটু জল পেলে আমি শত্রু ধ্বংস করে ফেলতে পারি। পিপাসায় তালু শুকিয়েছে। আর পারি না—জল কোথায় পাব ভাই।

এমন সময় আবদুল ওহাবের মাতা শাসনের সুরে বল্লেন ঃছি ছি কি লজ্জা…কি ঘৃণা তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ। কেন তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলে। ছিঃ কি লজ্জা…

—না কোন ভয় নাই। আমি আবার যাচ্ছি। আর ফিরবো না হয় নদীকুল উদ্ধার নয় মৃত্যু।

—হ্যা সেই কর্ত্তব্য।

—কিন্তু মা তোমার এবং স্ত্রীকে একবার শেষবারের মত দেখতে চাই। তাতে যদি পিপাসার শান্তি হয়।

—আচ্ছা দেখে যাও কিন্তু ঘোড়া থেকে নামতে পারবে না।

ওহাবের স্ত্রী এসে তার সঙ্গে দেখা করে বল্ল—তুমি কেন আবার ফিরে এলে। বীরের পক্ষে এটা বড় লজ্জার কথা।

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বাড়ির কথা, পরিবারবর্গের কথা মনে করতে নেই তাতে অনেক অসুবিধা হয়। যাও তুমি যুদ্ধ করে জয় তিলক নিয়ে ফিরে এস আমি তাই চাই।

তোমার ফিরে আসাটা ঘৃণার কথা। লোকে বলবে তুমি কাপুরুষ।

—আচ্ছা আমি যাই। বলে ওহাব আবার রণক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হ'লো।

হুঙ্কার ছেড়ে বলল—কইরে যোদ্ধার দল এই অল্প সময় ঈশ্বরের নাম করবার জন্য তোদের সময় দিয়েছিলাম—এবার আর জাহান্নমের পথে তোদের পাঠিয়ে দি। এগিয়ে আয়।

ওদিকে সেনাপতি ওমর চিন্তিতভাবে বলল—এখনই ওহাব আবার আসবে। সকলে প্রস্তুত থাকো।

—আচ্ছা আসুক। দেখা যাবে সে কত বড় ওস্তাদ

ওমর বলল—সে সত্যি-ই সোজা ওস্তাদ নয়। তার সঙ্গে পারা সোজা কথা নয়।

—আচ্ছা দেখা যাক।

এজিদের সৈন্যদের সীমা পরিসীমা নাই। ওহাব মারছে আর ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেষটায় শত্রুর আঘাতে ওহাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেল।

আবছুল ওহাবের মস্তক এসে তার মার নিকটে পারলো আর দেহ সমেত অশ্ব ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে এসে হাজির।

মাতার সম্মুখে এসে ঘোড়ার উপর থেকে ছিন্ন দেহখানা মাটিতে প'ড়ে গেল।

মা স্বযত্নে পুত্রের ছিন্ন অঙ্গ নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—প্রভু তোমার ভক্ত হাসানের নিমিত্ত, মদিনা বাসিদের নিমিত্ত, আমার পুত্র প্রাণ দিয়েছে।

সুতরাং এর দোষ মার্জ্জনা করে এর আত্মার স্বর্গে স্থান দিও।

প্রভু মহর্ম্মদবের বংশধরগণের পিপাসা শান্তির জন্য কাফেরের হস্তে প্রাণ দিয়ে সহিদ হ'যেছে এ তোমারই কৃপা।

আবছুল ওহাবের মৃত্যুতে হোসেন কাঁদিলেন পরিজন বর্গের ভিতরেও কান্নার রোল উঠে গেল।

আবছুল ওহাবের বিয়োগে তার মাতা পুত্র শোকে কাতর হ'য়ে সোজা একটানা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে হুঙ্কার দিযে বললেন—কোন কাফের, কোন পাপাত্মা কোন শৃগাল আমার পুত্রের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিস। ঈশ্বরের দোহাই এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে সেই নর পিশাচ একবার দেখা দিক। গালাগালি শুনে আবছুল ওহাব হন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বলল—এই রক্ত মাখা তরোয়ালেই তোর পুত্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেছি।

—ওরে কাফের এই নে তার শাস্তি বলে ওহাব মাতা ধারাল অস্ত্র দিয়া হন্তাকে এক আঘাতে নিমেষে তার মস্তক খণ্ডিত করে ফেল্ল।

ওহাব হন্তার মৃত্যু দেখে ওমর বহু সৈন্য নিয়ে বৃদ্ধাকে ঘিরে ফেল্লু।

বৃদ্ধা বললেন—বাবা আমার জীবনের আর কোন সখ নাই। বাঁচবারও আর ইচ্ছা নাই। বৎসগণ পুত্র শোকে আমি যুদ্ধে এসেছি। তোমরা আমাকে নিপাত কর।

যে পথে আমার আবদুল গেছে আমি সেই পথেই যেতে চাই।

এই পাপ জগতে আর থাকবার বাসনা নাই। বলতে বলতে এক ঘাতকের হাতে তার মৃত্যু হ'লো। তারপর এলো গাজি রহমানের পালা তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে যুদ্ধ করতে করতে শেষটায় গাজি রহমানের মৃত্যু হ'লো।

কারবালার প্রান্তর দিন দিন শত্রু মিত্রের রক্তে লাল টক্‌টকে হ'তে লাগল।

যে রক্ত কোন দিনই মুছে যাবে না।

আবদুল ওহাবের মাতার মৃত্যুর পর সংবাদ পেয়ে হজরত হোসেন বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন এমন সময় হাসান পুত্র কাসেম এসে বললেন—অনুমতি করুন শত্রুকুল নির্ম্মূল করে আসি।

হোসেন বল্লেন—তুমি পিতৃহীন। তোমার মাতার তুমিই একমাত্র সন্তান। তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে কি করে পাঠাই।

—আপনি আমাকে করুণা করবেন না। এজিদের সৈন্যরা আমার কাছে মাছির মত। এক নিমেষে শত্রুদের বুঝিয়ে দিয়ে আসি যে পবিত্র বংশের কত শক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে একবার দেখুক।

—আমাদের বংশের তুমি একজন বিশেষ প্রাধান লোক। আমাদের অভাবে তুমিই এমাম বংশের মানরক্ষা করবে এক্ষেত্রে তোমাকে পাঠাই কেমন করে?

—আপনি যাই বলুন। কাসেমের প্রাণ দেহে থাকতে আপনার অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

—বৎস। আমার মুখে এ কথার উত্তর নাই, তোমার মাতার আদেশ পেলে তবেই যেতে পারবে।

—আচ্ছা মাতার নিকট হ'তে তাহলে বিদায় চেয়ে নিয়ে আসি।

—তাই যাও বাবা। তুমি তাঁর একমাত্র রত্ন।

তাতের নিকট হতে কাসেম মাতার নিকটে এসে বল্ল—জানি পিতা মৃত্যুকালে আমকে একখানি কবচ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেছিলেন যে সময় বিপদ ঘনিয়ে আসবে সেই সময় কবচের অপর পৃষ্ঠায় যেরূপ লেখা দেখবে তেমনি চলবে।

—এখন দেখ। তোমার আজকের বিপদের মত আর সমূহ বিপদ জীবনে কখনও আসেনি।

কবচের অপর পৃষ্ঠা দেখার উপযুক্ত সময় হ'য়েছে। মাতার কথায় কাসেম কবচের অপর পৃষ্ঠা দেখল কবচ দেখে কাসেম বল্ল মা দেখ কবচে লিখা আছে এখনি সখিনাকে বিয়ে কর। আর আম্মার কোন আপত্তি নাই এই বেশেই বিয়ে করবো।

—হাসনেবানু বল্ল এর ভেতর বিয়ে?

কারো মুখে হাসি নাই। কারো চোখে ঘুম নাই, কারো মুখে সন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই।

চারদিকে কেবল রণবাদ্য ··রণ-হুঙ্কার এরই ভেতর কাসেমের বিবাহ উৎসব।

পূর্ব্বেই প্রণয়, ভালবাসা উভয়েরই র'য়েছে। ভ্রাতা ভগ্নির যেরূপ শুদ্ধ প্রণয় থাকে এপ্রণয় সেইরূপ শুদ্ধ

বাল্যকাল হ'তেই এক সঙ্গে ক্রীড়া, একত্র ভ্রমণ সদা সর্বদার জন্য একত্র বসবাস।

ওদিকে এজিদের সৈন্য পক্ষের যুদ্ধ বাজনা বাজছে। বাজনার শব্দে ফোরাতের জল কূলছেপে যেন নেচে উঠেছে।

কাঁপছে যেন স্বচ্ছ জল প্রবাহ।

যুদ্ধ বাজনার ভেতর দিয়ে কাসেমের বিবাহ হ'য়ে গেল হোসেন বাধ্য হ'য়ে এই নিদারুণ দুঃখের সময়ে কাসেমের হাতে প্রাণাধিকা দুহিতা সাকিনাকে সমর্পন করলেন। বিধি মত বিবাহ সমাধা হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর আনন্দ অশ্রু দেখা দেয় কিন্তু এক্ষেত্রে তা দেখা দিল না।

কাসেমের বিবাহ সব চাইতে একটা করুণ মুহূর্ত্তের ব্যাপার।

বড় কন্যা উভয়েই সমবয়স্ক।

স্বামী স্ত্রীতে দুই দণ্ড নির্জ্জনে বসে কথা কার্ত্তা বলবে তার কোন সময় নাই।

বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেই গুরুজনগণের চরণ বন্দনা করে মহাবীর কাসেম আসি হস্তে দাঁড়িয়ে বললেন—এখন কাশিম শত্রু নিপাত করতে চল্‌ল। ফোরাতের জল রক্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। শত্রু রক্তে লালে আকার।

হাসনেবানু কাসেমের মুখ চুম্বন করে সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে বললেন—হে করুণাময় জগদীশ্বর কাসেমকে রক্ষা কর।

আজ কাসেম বিবাহ সজ্জা, সমর সজ্জা যুদ্ধ সজ্জা সব একাকার হ'য়ে গেল।

কাসেম অগ্রসর হ'লো।

হাসনেবানু বলতে লাগলেন—কাসেম একটু অপেক্ষা কর। আমার চির মন সাধ পুর্ণ করে নি।

তোমাদের দু'জনকে একত্রে বসিয়ে দেখতে আমার বড়ই মন ইচ্ছা। একটু দেখেনি—

এই বলে সাকিনা ও কাসেমকে বস্ত্র শিবিরের মধ্যে একত্র বসিয়ে বল্লেন—কাসেম তোমার স্ত্রীর নিকট হ'তে বিদায় নাও।

কাসেম বিদায় নিল।

হাসনেবাণু পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাকিনা বল্ল—কাসেম তুমি আমাকে প্রবোধ দিয়ো না। আমি মাত্র এই বললে যেখানে শত্রুর বংশ নাই এজিদের নাম নাই, কারবালা প্রান্তর নাই, ফোরাত জলের পিপাসা নাই সেইখানে যেন আমি তোমাকে পাই।

আমার প্রার্থনা। আর কিছু নয়।

প্রণয় ছিল পরিচয় হ'লো আর আবার আমার কি চাইবার থাকতে পারে।

যাবার সময় আলিঙ্গন করে বল্ল—আমি যুদ্ধ যাত্রী শত্রু রক্ত পিপাসু। আজ কত দিবস বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করি নাই। কিন্তু আমায় ক্ষুধা পিপাসা কিছুই নাই। তুমি কেঁদো না।

ঐ শোন শত্রুদের শিবিরে রণডঙ্কা বাজবার শব্দ ভেসে আসছে।

তোমার স্বামী মহাবীর হাসানের পুত্র হজরত আলীর পুত্র কাসেম তোমার স্বামী।

সখিনা এখন আমি বিদায় হই।

—হ্যা নিশ্চয়ই যাবে।

—খুব সাবধান মত যুদ্ধ করবে।

—যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাবধানতা থাকে না।

—তবে যাও তোমাকে ঈশ্বরে হাতে সঁাপিলাম। কিন্তু কাসেম। যুদ্ধে যাও।

প্রথম রজনীর সমাগম আশায় অস্তমিত সূর্য্যের মলিন ভাব দেখে প্রফুল্ল হওয়া সখিনার ভাগ্যে নাই। যাও যুদ্ধে যাও—

কাসেম আর সখিনার মুখের দিকে চাইতে পারলো না। বিষাদিত মন নিয়ে এগিয়ে চল্ল।

মরণ।

মরণের আলিঙ্গন চলতে দিবা রাতে…কাসেম যুদ্ধক্ষেত্রে যেয়ে বল্লেন—যুদ্ধে যদি কারো সখ থাকে তবে আমার নিকটে এসে দেখ পাপিষ্ঠরা ইহজগতের শেষ দিন তোদের দেখিয়ে দি।

সেনাপতি ওমর পূর্ব থেকেই কাসেম কে ভালভাবে চিনতেন।

তিনি জানতেন কাসেমের মত বীর তার সৈন্য মধ্যে আর দ্বিতীয়টা নাই।

সে একাই সমস্ত সৈন্যের চক্ষে অন্ধকার দেখিয়ে দিতে পারে।

কে যাবে কাসেমের সম্মুখে।

সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠলো মহা চিন্তায়।

যে তার সমুখে পরবে সত্যি-ই তার আর রক্ষা নাই। ইহজগতের ভাত কাপড় তার পরিশোধ হ'য়ে যাবে।

উপায় বিহীন হ'য়ে সকলেই ওমরকে বল্ল কে যাবে কাসেমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কে যাবে। ওমর বল্ল—ভাই বর্জ্জক তুমি ভিন্ন কাসেমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এমন লোক আমাদের মধ্যে আর দেখি না। তোমাকেই যেতে হবে।

আমার মনে হয় তুমি একমাত্র কাসেম হ'তে মহাবীর।

তুমি কাসেমের জীবন সংহার করে এস।

বর্জ্জক বল্লেন—বড় ঘৃণার কথা। শামদেশের বড় বড় বীরের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়েছি। মিশরের প্রধান প্রধান বীরগণ আমার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। আর এই সামান্য বালকেকের সঙ্গে কি যুদ্ধ করবো। বড়ই ঘৃণার কথা।

আমাকে এর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বলছেন এটা আমার দুঃখের কথা।

হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ হ'লে তাও খানিকটা শোভা পেতো। কাসেমের সঙ্গে যুদ্ধ তাহ লজ্জা মনে হ'চ্ছে।

আমি কাসেমের সঙ্গে কখনই যুদ্ধ করতে পারবে না। ওমর বল্ল—তুমি কাসেমকে চেন না তাই বলছ! সারা মদিনায় এমন বীর আর দু'জন নাই।

হাসতে হাসতে বর্জ্জক বল্লেন—কাকে আপনি কি বলছেন।

তাকে কেটে কি আমি বিশ্ব বিজয়ী বীর হ'ন্তের অব মান না করবো ?

—তবে কে যাবে ?

—আমার আরও চারিপুত্র আছে। তাহারা কাসেম থেকে সহস্র গুণ যুদ্ধ বিশারদ। ওদের আপনি পাঠিয়ে দিন তাহ'লে ওরাই গিয়ে বালক কাসেমের মাথা কেটে আনবে। আমার পুত্রই যথেষ্ট।

ওমর আর বিরুক্তি না করে বর্জ্জকের পুত্রদের একটিকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রথমেই বর্জ্জকপুত্র কাসেমের মাথা লক্ষ্য করে তীর ছুরলেন।

অস্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল পুনর্বার আঘাতে কাসেমের বামহস্ত বিদ্ধ হ'য়ে গেল তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়ি খুলে ক্ষত স্থানে বেঁধে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে নিল।

বর্জ্জক পুত্র বল্ল—কাসেম তলোয়ার রাখ। তোমার হাতে আঘাত লেগেছে। বর্ষা ধারণে তুমি অক্ষম।

বর্ষার কথা বলতে বর্জ্জকের পুত্র ধরা শায়ি হ'ল। কাসেমের আঘাতে তার বক্ষ বিদির্ণ হ'য়ে গেল। তখন কাসেম আবার বলল—কাসেম আয় আর কে আসবি যুদ্ধের সাধ আছে মিটিয়ে দি।

দেখতে দেখতে কাসেম একাই বর্জ্জকের চার পুত্রকে হত্যা করলো।

পুত্র শোকাতুর বর্জ্জক এবার এগিয়ে আসল কাশেমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বর্জ্জক বল্ল—কাসেম তুমি ধন্য। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। পুত্রকে নিধন করেছ তাতে আমার দুঃখ নাই। কাসেম তুমি বালক। এখন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হ'য়ে পারছো

সপ্তাহ কাল তোমার উদরে অন্ন নাই। সে ক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা নিজের অবমান না।

কাসেম বল্ল বর্জ্জক—সে ভাবনা তোমার করতে হবে না।

তুমি পুত্র শোকাতুর তুমি আর আমার সঙ্গে কি যুদ্ধ করবে?

—আমি তোমার কথা স্বীকার করি। বলত' তুমি ঐ তরবারি খানি কোথায় পেলে?

কোথায় পেয়েছি বলে এক আঘাত করলো।

শিবিরে এসে সখিনার দেহ আলিঙ্গন করে বল্ল—সখিনা আর নয়। এবার বোধ হয় তোমাদের ছেরে চলে যাচ্ছি। অনেক কথা বলবার আছে। কিছুই বলা হ'ল না। পিতার কাছে চললাম। আবার সেখানে আমরা সব একত্রিত হবো।

—একি বলছ তুমি?

—এই সত্যি কথা সখিনা। দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসছে যাবার সময় নিকট হ'য়ে এসেছ।

ধীরে অতি ধীরে কাসেম মহাশান্তি কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না।

সখিনা দুঃখে শোকে চেতনা হীন হ'য়ে পড়ে। অনেক ক্ষণ পর হোসেনের পুত্র আলী আকারে আরো ভ্রাতৃদয় বল্লে—এখনও আমরা মরি নাই। আমরা যুদ্ধ ভয় করি না আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাই।

বলে তারা যুদ্ধে রওনা হ'লো।

আলি আকবর প্রথমেই ফুরাত কুলে গিয়া যুদ্ধাস্ত্র ছুড়িতে লাগলো।

পাহারা রত সৈন্যরা ত' যে যেদিকে পারে ছুটাছুটি করতে লাগলো।

যুদ্ধ ক্ষেত্র হ'তে বহু সৈন্য ক্ষয় করে আলি আকবর ফিরে এসে বললেন—আমি বহু শত্রু নিপাত করে এসেছি।

—ওটা তোমার পুত্রের হাতে ছিল। যা দিয়ে আমি তোমার পুত্রের মাথা দ্বিখণ্ডিত করেছি।

—ওটাকে আমি বড় যত্নকারে রেখেছিলাম সাজিয়ে।

—বেশ করেছিলে। তোমার অস্ত্র দিয়েই তোমার পুত্রদের জাহান্নমের পথ দেখাইয়া দিয়াছি। এবার তোমার পালা।

—কাসেম এবার আর তোমার রক্ষা নাই। বলিতে বলিতে বর্জক বর্শা ছুড়িল কাসেমের দিকে। বহুক্ষণে উভয়ের মধ্যে বর্শা যুদ্ধ হ'ল।

তারপর কাসেম এক আঘাতে বর্জ্জকের মাথা কেটে ফেল্ল।

বর্জ্জকের নিপাত দেখে কেহই আর কাসেমের সঙ্গে যুদ্ধে আসতে সাহস পায় না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কাসেম ফোরাত কুলের নিকট আসিলেন।

নদী রক্ষকেরা ভয়ে পলায়ন আরাম্ভ করল। মোসলেম কাহাকেও কিছু বললেন না।

কাসেমের সঙ্গে কেহই টিকিতে পারে না। কাসেমের শ্বেত বর্ণের অশ্ব দেহ তীরের আঘাতে লাল বর্ণ রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে।

রক্তে রক্তে চারিদিক অন্ধকার।

শেষটায় নিরুপায় হ'য়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিলেন এবং কাসেম শত্রু নিধন করতে করতে নিজ শিবিরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

এসেছি। কিন্তু পিপাসায় বুক ফেটে যায়। পুত্রের কথায় হোসেন বল্লেন—বাবা—আজ দশ দিন চোখের জল ভিন্ন অন্য আর কিছু চোখে দেখিনি। এই জল জল করেই বোধ হয় সমস্ত লোকের জীবন নাশ হয়।

তারপর আলি আকবরের নিকট গিয়ে বল্লেন—পুত্র তুমি আমার জিহ্বা 'তোমার মুখের মধ্যে দিয়ে কিছুটা পিপাসা শান্তি কর।

আলি আকবরের পিপাসা এতে শান্ত হ'য়ে গেল ঈশ্বরের নাম করতে করতে সে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চল্ল।

আলি আকবরের যুদ্ধে ভয়ানক ভীত ভাবে ওমর বল্ল ভাই সব আলির হাতে আমরা সকলেই ধীরে ধীরে মারা পরবো। তার চাইতে এস এক সঙ্গে আঘাত করি নইলে আর রক্ষা নাই।

এক সঙ্গে সকলে তাকে আক্রমণ করল।

বহুক্ষণ যুদ্ধ চলবার পর আলি আকবর নিহত হ'লে। তখন জয়নাব আবেদীন যুদ্ধক্ষেত্রে পস্তুত হ'তে লাগলো।

হোসেন ভাবলো জয়নাব নিহত হ'লেই মাতামহ বংশ সত্যিই শেষ হ'য়ে যাবে।

সুতরাং জয়নাবকে তোমরা সর্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখ। সে যেন যুদ্ধে না যেতে পারে।

এর কিছুক্ষণ পরেই হোসেন যা চোখের উপর শূন্যপথে দেখতে পেলেন তাতে তার অন্তর শুকিয়ে উঠলো।

হোসেন অমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে নিজে যুদ্ধ সাজে সেজে নিলেন।

রণসাজে সেজে তিনি এসে শিবিরের বাইরে দাঁড়ালেন। সকলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

সকলের কান্নায় হোসেন শান্ত কণ্ঠে বল্লেন—কোন ভয় নাই ভগবানের ইচ্ছায় মানুষকে চলতে হয়। এ অনন্ত পারাবার তাঁহারই ইচ্ছায় চালিত হয়।

যাবার সময় সকলের কান্নার মধ্যে হোসেন পুত্রকে কোলে নিয়ে বল্ল পুত্র দুঃখ করো না। তুমি সর্বদা মায়ের নিকট থাকবে, শিবিরের বাইরে যেয়ো না। আবার রোজ কেয়ামতে তোমাদের সকলের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

বলতে বলতে সকলকে অভিবাদন করে হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হ'লো।

মহাবীর হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বল্ল—ওরে বিধর্মী পাপাত্মা তোরা কোথায় আয়। দামেস্ক থেকে তুই পামর এই সমস্ত নররক্তক্ষয় করাচ্ছিস।

আয় পামরের দল তোদের প্রত্যেকের লোমে লোমে প্রতিশোধ নেব। আয় আয় আমার আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না। কে পরলোক দেখতে চাস তোদের সে সাধ মিটিয়ে দি।

এজিদ পক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আবদুল রহমানের অনেক দিনের সাধ হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

সেই আবদুল রহমান অসি হ'স্তে এগিয়ে এলেন এসে বল্ল—হোসেন অনেক দিন পানাহার কর নাই। তোমার যুদ্ধ করতে সত্যিই ভারী কষ্ট অনুভব হচ্ছে। এস তোমার যুদ্ধ সাধ আজ মিটিয়ে দি।

বেশ এস তোমার যুদ্ধ সাধ মিটিয়ে দি। আমার শোকের কিঞ্চিৎ উপশমহেতুক। তুমি আগে আঘাৎ কর নইলে তোমার দেহে আমি আঘাত করতে পারবো না।

হোসেন বল্ল—এত কথায় প্রয়োজন কি। আমরা বাকযুদ্ধ করতে আসি নাই। অসি হস্তে এগিয়ে এস দেখি তোমার মরনের সাধ মিটিয়ে দি।

—আচ্ছা তবে দেখ, তোমার মাথার মূল্য লক্ষ টাকা বলে আবদুল রহমান এক আঘাত হাসলো হোসেনের মস্তকে।

হোসেনের বার্ম্মপরি আঘাত লাগ্যয় আঘাত প্রতিহত হল।

আবদুল রহমান ভয়ে পলাইতে যাইতেছে হোসেন বলিলেন—যাস কোথায় রে। আয় তোর আজ জন্ম দিন যাবি কোথায়, আর কি তোর রক্ষা আছে। বলতে বলতে এমাম হোসেন এক কোবে তাকে ধরাশায়ি করে দিল।

হোসেনের আঘাতে চক্ষের নিমেসে ভয়ে দিশেহারা হয়ে এজিদ সৈন্যকে যে দিকে পায় পলায়ন কর্‌ল।

হোসেন একা একা সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

শত্রুক্ষয় করতে করতে হোসেন ফোরাতকুলের এমন অবস্থা করে তুল্ল যে একজন সৈনিকও আর জিবীত রইল না।

তখন জলের নিকট এসে কাপড় জামা ছেড়ে হাত পা ধুয়ে জল খেয়ে মনে আনন্দের আর সীমা পরিসীমা নাই।

কূলে অশ্ব রেখে তিনি জলে নেমে পরলেন দশ দিন পর জল পেয়ে মনে হয় সমস্ত নদী সমেত বুঝি সে পান করিয়া লয়।

অঞ্জলি ভরে জল পুরে মুখে দিবেন এমন সময় মনে পড়লো বাড়ির কথা।

বাড়িতে কতকগুলি শিশু সমেত আরও সব পরিজনবর্গ রয়ে গেছে।

কি ক'রে সে জল মুখে দেয়

জল ছেড়ে সে শিবিরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। রাস্তার মধ্যে খালি হাতে হোসেনকে দেখে লক্ষ্য করছিল।

কিছুদূর লক্ষ্য করবার পর। এক বিশাক্ত শর এসে হোসেনকে বিদ্ধ করলো। ভয়ানক যন্ত্রণা।

হোসেন বিষের যন্ত্রণায় অতিশয় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল।

শেষ সীমার তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হোসেন মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে সম্মুখে সীমারকে দেখে চমকে উঠল।

সীমার এসে হোসেনের বুকের উপর চেপে বসলো তখন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও হোসেন বল্‌ল—সীমার তুমি এসে আমার বুকের উপর চেপে বসেছ। পরকাল বলে কি আর কিছুই ভয় করনা।

—না। মুরনুবি মহাম্মদকে। আমি ওসব ভয় করিনা তবে এবার তোমার শেষ সময়। তুমি মরবার জন্যপ্রস্তুত হও।

—আমি খুব অস্থির আছি বিষের যন্ত্রণায়। আর আমার সময় নাই। দেহ শত খণ্ড করিতে ইচ্ছা হয় করিও একটু সরে বস। নিশ্বাস ফেলতে দাও ভাই।

—যা যে তোমার বুকের উপর বসেছি তোমার মাথাটা কেটে তবে উঠবো।

—তুমি ক .টবে ?

—হ্যাঁ আমি।

—দেখি তোমার বুক খুলে দেখাও ত। আমার কাতেলকে আমি চিনতে পারবো। বুক দেখিয়ে

—সীমার খঞ্জর হাতে হোসেনের গলায় খঞ্জর দিয়া শিরচ্ছেদ করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিছুতেই মাথা দ্বিখণ্ডিত হয় না। চেষ্টা করলেও গলা কাটা যায় না।

হোসেন বল্‌ল ওমন করে আমার গলা কাটা যাবেনা এবং আমিও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছি। তুমি আমার উপর সদয় হ'য়ে একটু অনুগ্রহ কর আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করছি পরকালে তোমাকে স্বর্গ বাস করাইব। হোসেনের কথায় বক্ষ পরিবর্ত্তন করে সীমার পৃষ্ঠোপরি বসল।

এমামের দুখানি হস্ত দু'দিকে প'রে গেল। সীমার ঘাড় ছাড়িয়া তীর বিদ্ধ স্থানে খঞ্জর বসিয়ে দিল অমনি হোসেনের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

আকাশ বাতাস চতুর্দ্দিক একটি রব হতে লাগল হায় হোসেন···হায় হোসেন···হায় হোসেন···

দাস্ত কারবালায় চিরকালের তরে হায় হায় রব ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সমাপ্ত